শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

ষষ্ঠ শ্রেণি

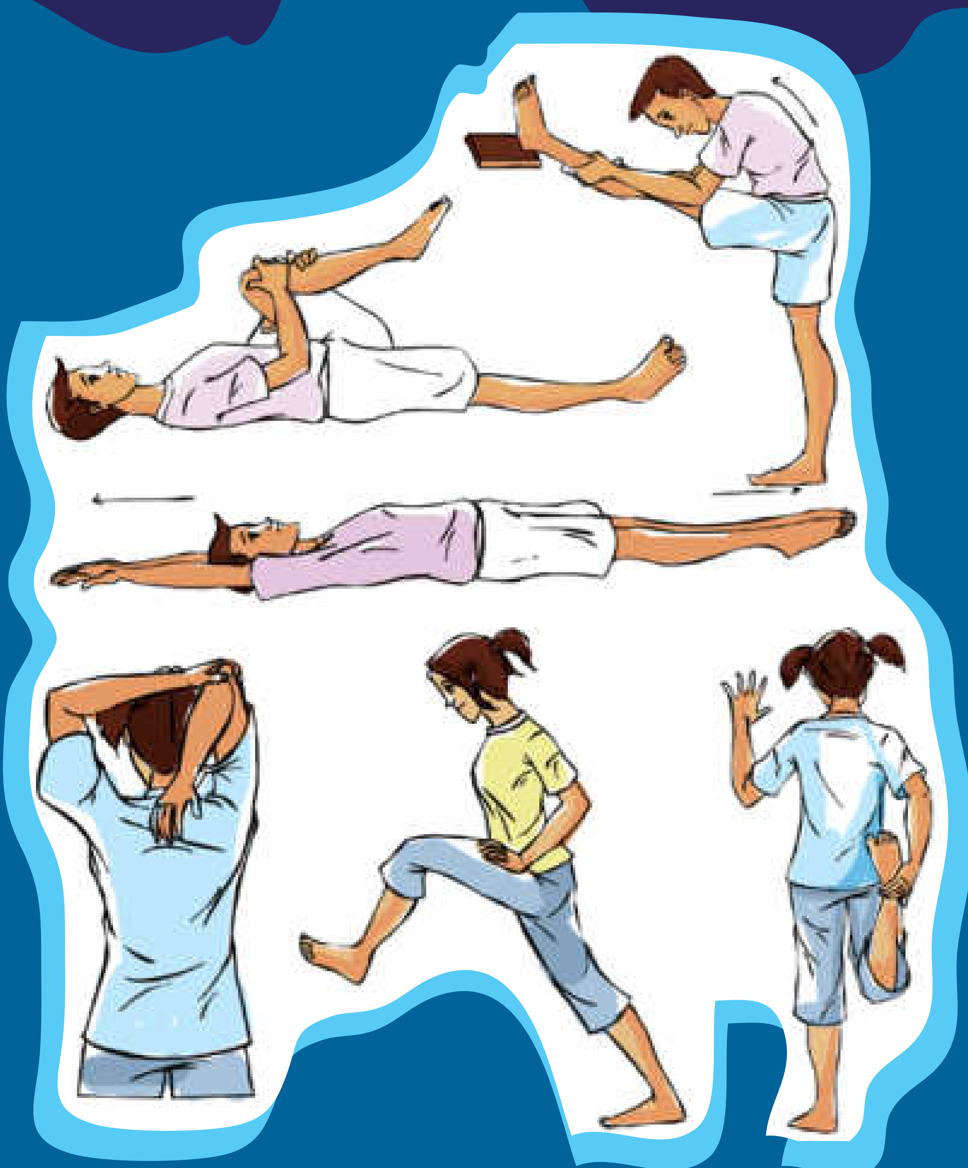

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর আ ব ম ফারুক

আবু মুহম্মদ

মোঃ আবদুল হক

মোঃ তাজমুল হক

জসিম উদ্দিন আহম্মদ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি 'সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন' এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির **শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য** বিষয়টি মূলত ব্যবহারিক বিষয়। তাই হাতে কলমে শিক্ষার জন্য বইটিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বইটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টিজ্ঞান, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রজননস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। একইসাথে বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার যথার্থ নিয়মকানুন জেনে একজন সুস্থ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	শরীরচর্চা ও সুস্থ জীবন	১–১৫
দ্বিতীয়	স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং	১৬–২৯
তৃতীয়	স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা	৩০–৪১
চতুর্থ	আমাদের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল	৪২–৪৯
পঞ্চম	জীবনের জন্য খেলাধুলা	৫০ – ৬৮

প্রথম অধ্যায়

শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন

আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে। আমাদের সেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়মমত নড়াচড়া করাকেই শরীরচর্চা বলে। এটিকে আবার ব্যায়ামও বলে। এর মাধ্যমে দেহের কাঠামো সুন্দরভাবে গঠিত হয়। দেহের সুগঠনের সাথে সাথে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থারও উন্নয়ন ঘটে। এই ব্যায়াম বা শরীরচর্চার মাধ্যমে আমাদের চিত্ত বিনোদন যেমন হয়, তেমনি আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোভাবও গড়ে ওঠে।

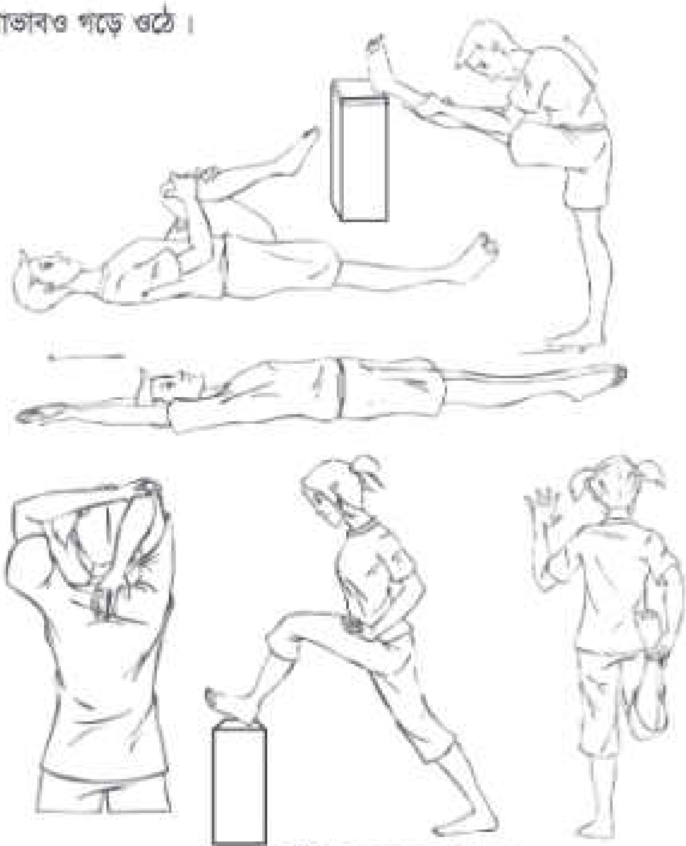

বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- প্রাত্যহিক সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক সমাবেশের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, আদেশ মেনে চলা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হব।
- ব্যায়ামের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হাত ও কাঁধের ব্যায়ামের নিয়মকানুন ও কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব।
- সঠিক নিয়ম-কানুন মেনে হাত ও কাঁধের ব্যায়াম করতে পারব।

পাঠ—১ : প্রাত্যহিক সমাবেশের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

ক্লাস শুরুর আগে বিদ্যালয়ের সামনে খোলা জায়গায় প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের সমবেত হওয়াকে সমাবেশ বলে। শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলার সাথে শ্রেণি অনুযায়ী ফাইলে দাঁড়াবে। শ্রেণির মেয়েরা সংখ্যায় বেশি হলে সব শ্রেণির মেয়েরা একত্র হয়ে একটি আলাদা ফাইলে দাঁড়াবে। পতাকাদণ্ডের ডান পাশে প্রধান শিক্ষক, বাম পাশে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক দাঁড়াবেন। অন্যান্য শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের পেছনে এক লাইনে দাঁড়াবেন। যেসব শিক্ষার্থী উচ্চতায় খাটো তারা সামনে দাঁড়াবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিমিত জায়গা রেখে দাঁড়াবে যেন হাত তুলে শপথ নেওয়ার সময় কারোর গায়ে হাতের স্পর্শ না লাগে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে শ্রেণির ফাইলের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক সমাবেশটি পরিচালনা করবেন।

প্রাত্যহিক সমাবেশ

সমাবেশে দাঁড়ানো

সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রম

১. **জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন—** বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। ওই সময় সকল শিক্ষার্থী 'সোজা' হয়ে দাঁড়াবে, নড়াচড়া করবে না। জাতীয় পতাকাকে 'সম্মান প্রদর্শন করো' বলার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাত তুলে সবাই সম্মান প্রদর্শন করবে।

২. **পবিত্র কুরআন হতে কিছু অংশ পাঠ—** একজন শিক্ষার্থী সামনে এসে পবিত্র কুরআন থেকে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে। এ সময় শিক্ষার্থীরা আরামে দাঁড়াবে।

৩. **শপথবাক্য পাঠ—** শিক্ষার্থীরা 'সোজা' (attention) অবস্থায় থেকে ডান হাত কাঁধ বরাবর সামনে তুলবে। আঙুলগুলো খোলা অবস্থায় একত্রে থাকবে। একজন শিক্ষার্থী শপথবাক্য পাঠ করবে এবং অন্য সবাই তার সাথে তা পাঠ করবে। শপথ গ্রহণ শেষে 'হাত নামাও' বলার সাথে সাথে সকলে একসাথে হাত নামাবে।

শপথ : "আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকিব। অন্যায় ও দুর্নীতি করিব না এবং অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিব না।

হে প্রভু, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করিতে পারি, এবং বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারি।" আমিন

৪. **জাতীয় সংগীত—** শিক্ষকমণ্ডলীসহ শিক্ষার্থীরা একত্রে জাতীয় সংগীত গাইবে।

৫. প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভাষণ (প্রয়োজন বোধে)

৬. পাঁচ মিনিটের জন্য শরীর চর্চা/পিটি অনুশীলন (প্রয়োজন বোধে মার্চিং গান গাইবে)

৭. সমাবেশ শেষের গান

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে।
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় সংগীত শেষে প্রাত্যহিক সমাবেশ সমাপ্ত হবে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিশিক্ষকের সাথে সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাবে। প্রাত্যহিক সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। তারা নেতার প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে।

কাজ–১ : শিক্ষার্থীরা সমাবেশে কীভাবে আসবে, এবং মাঠে কীভাবে দাঁড়াবে দেখাও।
কাজ–২ : শপথের সময় হাত ও পায়ের অবস্থান কেমন হবে, ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের সময় হাত কোথায় ধরা থাকবে ব্যবহারিক ক্লাসে প্রদর্শন কর।
কাজ–৩ : জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন প্রদান বাস্তবে করে দেখাও, সমাবেশের বিভিন্ন কাজ ছোট ছোট দলে ভাগ করে অনুশীলন কর।

নতুন শব্দ : লাইন : একজনের পাশে আরেকজন অর্থাৎ পাশাপাশি দাঁড়ানোকে লাইন বলে।
ফাইল : একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ানোকে ফাইল বলে।

পাঠ–২ : ব্যায়ামের উপকারিতা

দেহ ও মনের সুস্থতা ও আনন্দ লাভের জন্য শারীরিক অঙ্গসঞ্চালনকে ব্যায়াম বলে। খেলাধুলাও ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত। খেলাধুলার মাধ্যমে অঙ্গসঞ্চালন হয় এবং আনন্দ লাভ করা যায়। বিভিন্ন চিত্তবিনোদনমূলক খেলার মাধ্যমেও অঙ্গসঞ্চালন বা ব্যায়াম করা যায়। ব্যায়ামের মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি ছাড়াও মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করা যায়।

ব্যায়ামের মাধ্যমে যেসব উপকার লাভ করা যায় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি : ব্যায়াম দেহ কাঠামোর সুষম উন্নতি ও বৃদ্ধি সাধন করে। দেহের উন্নতির সাথে সাথে মনকে সতেজ করে। ফলে শরীরের শক্তি ও সহনশীলতা বাড়ে। ব্যায়ামের ফলে শরীরের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(২) পাঠের একঘেয়েমি দূর করে : শ্রেণিকক্ষে একটানা লেখাপড়া করলে ক্লান্তি ও একঘেয়েমি আসে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করলে পাঠের একঘেয়েমি ও মানসিক ক্লান্তি দূর হয়, মনে সজীবতা আসে ও পড়াশোনায় মন বসে।

(৩) স্নায়ু ও মাংসপেশির সমন্বিত উন্নয়ন : শৈশবে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত বেড়ে ওঠে। শরীর বৃদ্ধি পেলেও অনেক সময় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানসিক বিকাশ হয় না। এর সমন্বয় ঘটানোর জন্য সঠিক নিয়মে অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন। হাত, পা ও শরীরের ব্যায়াম একসাথে করতে হবে। শুধু হাতের ব্যায়াম করলে হাতের শক্তি বাড়বে আবার পায়ের ব্যায়াম করলে পায়ের মাংসপেশি বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়ামের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে অনুশীলন করতে হবে।

(৪) সুশৃঙ্খল জীবনযাপন : নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে উঠবে। ফলে শিক্ষার্থী প্রাত্যহিক জীবনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে।

(৫) সামাজিক গুণাবলি অর্জন : দলগত খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শিক্ষক বা দলনেতার আদেশ মেনে শৃঙ্খলার সাথে খেলতে হয়। খেলায় হেরে গেলেও মেজাজ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ করতে হয়। আদেশ মেনে চলা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মেজাজ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, সহযোগিতা করা– এই সামাজিক গুণগুলো ব্যায়ামের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

শিক্ষার্থীদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে ব্যায়ামের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের ব্যায়ামের তালিকা আলাদা হবে। তবে ব্যায়াম করতে হবে পরিমিত। পরিমিত ব্যায়াম না করলে স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। শরীর ও মন দুর্বল হয়ে পড়ে। ভরাপেটে ব্যায়াম করতে নেই। খাবার খাওয়ার কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পরে ব্যায়াম করা উচিত।

কাজ–১ : ব্যায়ামের উপকারিতা খাতায় লিখ।

কাজ–২: ব্যায়াম করলে কী কী সামাজিক গুণ অর্জন করা যায় তা বর্ণনা কর।

কাজ–৩ : অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফল দলগত কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৩ : ব্যায়ামের নিয়মকানুন

ব্যায়াম করলেই শরীরের সার্বিক উন্নতি আশা করা যায় না। সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে ব্যায়াম করলে কেবল তখনই দেহ ও মনের সার্বিক উন্নতি সাধিত হবে। ব্যায়ামের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যায়ামের ধরন নির্ধারণ করতে হবে। ব্যায়ামের ধরন নির্ধারণের আগে শিক্ষার্থীদের বয়স, উচ্চতা ও শারীরিক সামর্থ্য বিবেচনা করতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যায়াম নির্ধারণ করতে হবে। খোলা জায়গায় বা মাঠে ব্যায়াম অনুশীলন করা উচিত।

ওয়ার্ম আপ

ব্যায়াম করার আগে শরীর গরম করে নিতে হয়। খেলাধুলার পরিভাষায় শরীর গরম করাকে 'ওয়ার্ম আপ' বলে। শরীর গরম হলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কর্মক্ষম হয়ে ওঠে, ফলে আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

ওয়ার্ম আপ করার নিয়ম–

(১) ওয়ার্ম আপের প্রথম ধাপ হলো স্ট্রেচিং। স্ট্রেচিং করলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জোড়া/সন্ধিগুলো ঢিলা হয়, ফলে ব্যায়ামের সময় সন্ধিগুলোর বা মাংসপেশির টিস্যুগুলো ছিঁড়ে যায় না।

(২) স্ট্রেচিং শেষে জগিং (আস্তে আস্তে দৌড়) করতে হবে। এভাবে পাঁচ মিনিট দৌড়াতে হবে।

(৩) জগিং এর শেষদিকে ক্রমান্বয়ে দৌড়ের গতি বাড়াতে হবে।

(৪) ব্যায়াম দু ধরনের : ১। সাধারণ ব্যায়াম ২। নির্দিষ্ট ব্যায়াম
১। সাধারণ ব্যায়াম- শরীর গরম করার জন্য যে কোন ধরনের ব্যায়ামকে সাধারণ ব্যায়াম বলে।
২। নির্দিষ্ট ব্যায়াম- কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা সকল অঙ্গের উন্নতির জন্য যে ব্যায়াম করা হয় তাকে নির্দিষ্ট ব্যায়াম বলে।

(ক) যদি কোনো ছন্দময় ব্যায়াম করতে হয় তাহলে কমপক্ষে ১০-১২টি পিটি বাছাই করে প্রতিদিন একটি বা দুটি করে পিটি অনুশীলন করতে হবে।

(খ) শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম করতে হলে যদি হাতের শক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে চিন আপ, পুশ আপ, মেডিসিন বল নিক্ষেপ ইত্যাদি ধরনের ব্যায়াম নির্বাচন করে অনুশীলন করতে হবে। এভাবে শরীরের যেকোনো অঙ্গের উন্নতি করার জন্য তার সাথে মিল রেখে ব্যায়াম বাছাই করে অনুশীলন করলে ব্যায়ামের সুফল পাওয়া যাবে।

(গ) যদি কোনো খেলাধুলা শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যায়াম করতে হয় তাহলে উক্ত খেলার কৌশল বেছে নিয়ে পর্যায়ক্রমে ব্যায়াম অনুশীলন করতে হবে। যেমন- ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট খেলার মুখ্য অংশ হলো (১) ব্যাটিং, (২) বোলিং, (৩) ফিল্ডিং। প্রথমে যে কৌশল শিখতে চায় সেই কৌশলের ব্যায়াম নির্বাচন করে অনুশীলন করতে হবে।

উল্লিখিত নিয়মে ব্যায়াম নির্বাচন করে অনুশীলন করলে তবেই একজন শিক্ষার্থী সফল হবে এবং সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে শরীর ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে আসবে। তাই মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়াম করা উচিত নয়।

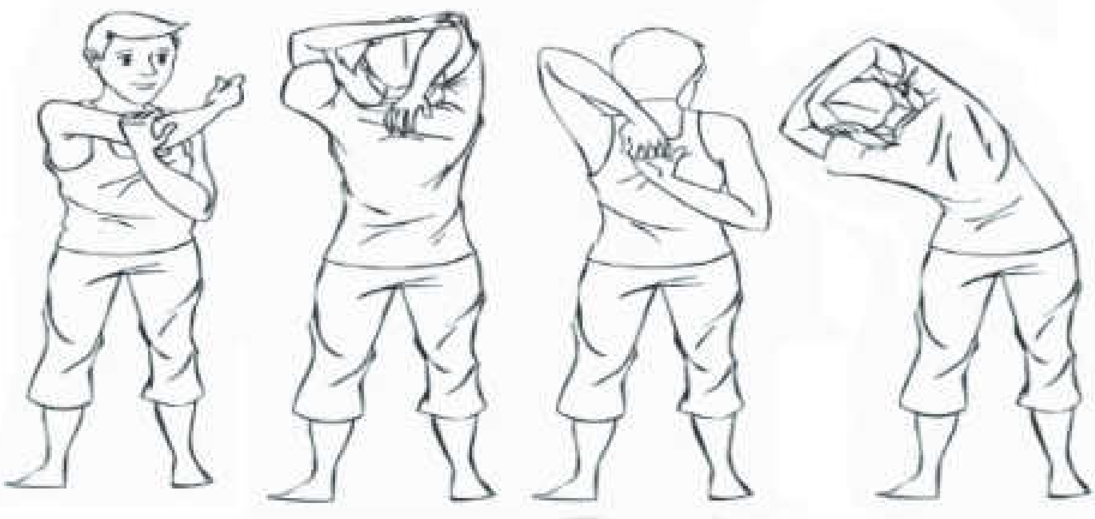

কাজ–১ : ব্যায়াম কিসের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করতে হয়? ছেলেমেয়েদের জন্য কোন কোন ব্যায়াম প্রযোজ্য?

কাজ–২ : ওয়ার্ম আপের অর্থ কী? ওয়ার্ম আপ না করলে কী হয়?

কাজ–৩ : স্ট্রেচিং এবং ওয়ার্ম আপ- এর ব্যায়ামগুলো অনুশীলন কর।

নতুন শব্দ

১। স্ট্রেচিং (Stretching) : অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো প্রসারিত করা।

২। ওয়ার্ম আপ (Warm up) : ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর গরম করা

৩। টিস্যু (Tissue) : কোষের সমষ্টি।

৪। চিন আপ (Chin up) : থুতনি উপরের দিকে তোলা।

৫। পুশ আপ (Push up) : দুই হাতের ওপর ভর করে শরীর নিচে থেকে উপরে তোলা।

২০১৮

৬। মেডিসিন বল (Medicine Ball) : চামড়া বা রাবারে আচ্ছাদিত ভারী বিভিন্ন ওজন শ্রেণির বল।

৭। স্পিড (Speed) : গতি।

৮। জগিং (Jogging) : আস্তে আস্তে দৌড়।

পাঠ–৪ : সমবেত ব্যায়াম

শিক্ষার্থীরা যখন একসাথে মিলিত হয়ে ব্যায়াম অনুশীলন করে তাকে সমবেত ব্যায়াম বলে। শ্রেণি অনুসারে বা দলগতভাবে সমবেত ব্যায়াম করা যায়। প্রাত্যহিক সমাবেশের পর যে পিটি করানো হয় উক্ত পিটিও সমবেত ব্যায়ামের মধ্যে পড়ে। শিক্ষার্থীদের প্রথমে সংখ্যানুসারে ফাইলে বিভক্ত করে দাঁড় করাতে হবে। যদি সংখ্যা ৩০জন হয় তাহলে ৬টি ফাইলে দাঁড়াবে। প্রতি ফাইলে পাঁচজন করে থাকবে। যদি সংখ্যা কম হয় তাহলে ফাইলের সংখ্যা কমে যাবে। শিক্ষার্থী কম হলে লাইনে দাঁড় করানো যায়। নিচে চিত্রের সাহায্যে দাঁড়ানোর অবস্থান দেখানো হলো–

সমবেত ব্যায়াম

সমবেত ব্যায়াম করার নিয়ম : শিক্ষার্থীরা প্রথমে ফাইলে দাঁড়াবে। শিক্ষক বা দলনেতার সংকেতের সাথে সাথে তারা ব্যায়াম শুরু করবে। নিচে ৮টি ব্যায়ামের শুরু ও শেষ কীভাবে করবে তা দেখানো হলো–

১। 'এক নম্বর পিটির জন্য প্রস্তুত' বললে সবাই তখন সোজা অবস্থানে চলে আসবে। যখন বলবে এক নম্বর পিটি আরম্ভ করো– তখন শিক্ষার্থীরা ১-১৬ পর্যন্ত মুখে গণনা করবে ও প্রত্যেক গণনার সাথে হাত ও পায়ের কাজ করতে থাকবে। এভাবে ১-১৬ পর্যন্ত করে থেমে যাবে ও আগের অবস্থায় অর্থাৎ আরামে দাঁড়ানো অবস্থায় চলে যাবে।

২। শিক্ষক বলবেন 'দুই নং পিটির জন্য প্রস্তুত' তখন শিক্ষার্থীরা সোজা অবস্থানে চলে আসবে। 'দুই নং পিটি শুরু করো'- তখন শিক্ষার্থীরা ১-১৬ পর্যন্ত মুখে গণনা করবে ও গণনার সাথে সাথে পিটি করবে।

৩। এভাবে ক্রমান্বয়ে পিটি করতে থাকবে। যেমন–

ক. দুই হাত কোমরে রেখে হাঁটু উঁচু করে লাফাবে। মুখে ১৬ বলার সাথে সাথে থেমে যাবে।

খ. ১ বললে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত ওপরে তুলে তালি দেবে। ২ বললে দুই হাত পাশে নামাবে। এভাবে ১৬ পর্যন্ত গণনা করবে।

গ. দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাত পাশে প্রসারিত করবে। ১ বললে প্রসারিত, ২ বললে নিচে নেমে পায়ের সাথে এসে লাগবে। এভাবে ১৬ পর্যন্ত গণনা করবে।

ঘ. দুই হাত কোমরে রেখে লাফ সহকারে দুই পা ফাঁক করবে ও একত্রে আসবে।

ঙ. দুই হাত কোমরে রেখে তালে তালে একবার বাম পা পাশে ওঠাবে ও একবার ডান পা পাশে ওঠাবে।

চ. দুই পায়ের ওপর সমান ভর করে দাঁড়িয়ে একবার মাথার ওপরে তালি, আর একবার বাম পায়ের নিচে তালি। এভাবে ডান পায়ের নিচে একবার ও বাম পায়ের নিচে একবার তালি হবে।

ছ. দুই হাত কোমরে রেখে মাথা একবার বামে-সোজা-ডানে এভাবে ১৬ পর্যন্ত গণনা করবে।

জ. বাম হাত ওপরে পজিশন নেবে। ১ বললে ডান হাত গিয়ে বাম হাতে তালি দেবে ও বাম হাত নিচে চলে আসবে। আবার বাম হাত ওপরে গিয়ে ডান হাতে তালি দিলে ডান হাত নিচে নেমে আসবে। এভাবে ১৬ বার পর্যন্ত গণনা করবে।

কাজ–১ : মাঠে প্রথম ফাইল ১ নং পিটি করে দেখাও। ২ নং ফাইল ৫ নং পিটি করে দেখাও। এভাবে সব ফাইল ভিন্ন ভিন্ন পিটি করে দেখাবে।

ব্রতচারী নৃত্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিত্তবিনোদনের জন্য বহু ধরনের লোকগীতি প্রচলিত রয়েছে। এই লোকগীতির পথিকৃত গুরু সদয়দত্ত। তিনি লোকগীতির মাধ্যমে লোকনৃত্যের মধ্য দিয়ে জনসমাজকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সৃষ্ট লোকনৃত্যকে ব্রতচারী নৃত্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর ফলে মানুষের চিত্তবিনোদন ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

ব্রতচারী নৃত্যগুলো হলো–

১. কাঠি নৃত্য ২. ঝুমুর নৃত্য ৩. লড়ি নৃত্য

এখানে কাঠি নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

কাঠি নৃত্য

সরঞ্জাম - ২ ফুট লম্বা দুটি রঙিন কাঠি

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা - কমপক্ষে ৫০জন

স্থান - খোলা জায়গা বা মাঠ

তাল - ধাতিং তা, ধাতিং তা

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী দুই হাতে ২টি কাঠি নিয়ে ফাইলে দাঁড়াবে। দুই ফাইলের মাঝে পরিমিত ফাঁকা থাকবে, যাতে কাঠি দিয়ে আঘাত করতে অসুবিধা না হয়। বাদ্যের তালে তালে বা লোকগীতির মাধ্যমে কাঠিনৃত্য করতে হবে।

প্রথমত : উভয় হাতের কাঠি সকলে একসঙ্গে নিচে আঘাত করবে, পরে বুক বরাবর এবং শেষে মাথার উপরে নিয়ে আঘাত করবে। সংকেতের সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হবে ও ফিরে আসবে। আঘাতের সময় একই সাথে পায়ের তাল থাকবে।

দ্বিতীয়ত : ফাইলে দাঁড়ানো সঙ্গীর সাথে ডান হাতের কাঠি দিয়ে সঙ্গীর বাম হাতের কাঠিতে ও বাম হাতের কাঠি দিয়ে ডান হাতের কাঠিতে আঘাত করবে।

তৃতীয়ত : কাঠিনৃত্য করতে করতে বৃত্ত করতে হবে। বৃত্ত করার পর বসে, মাথার উপরে, ডানে বামে সঙ্গীর কাঠিতে আঘাত করতে হবে।

চতুর্থত : ফাইল বা বৃত্ত অবস্থায় মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে প্রথমে মাটিতে, উপরে ও সঙ্গীর কাঠিতে আঘাত করতে হবে। পরে উঠে তালে তালে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসবে।

কাঠি নৃত্যের সময় মনে রাখতে হবে সকলের কাঠির আঘাত যেন একসাথে হয়। তাহলে আঘাতের আওয়াজও চমৎকার হবে। এ ভাবে বিভিন্ন ফরমেশনে কাঠিনৃত্য করা যায়।

নতুন শব্দ

১। পিটি (Physical Training) : শারীরিক কসরত।

২। কাউন্ট (Count) : গণনা।

৩। পজিশন (Position) : অবস্থান।

পাঠ-৫ : সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

আমাদের অনেকের ধারণা সরঞ্জাম ছাড়া কোনো ব্যায়াম করা কঠিন। কিন্তু আমাদের এ ধারণা ভুল। সরঞ্জাম ছাড়াও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করা যায়। সরঞ্জাম ছাড়া ব্যায়ামকে খালি হাতের ব্যায়াম বা Free hand exercise বলে।

সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম, যেমন-

১) পুশ আপ, ২) সিট আপ, ৩) স্পট জাম্প, ৪) ফ্লেক্সিবিলিটির ব্যায়াম, ৫) হাফ সিটেড এলবো, ৬) রানিং, ৭) জাম্পিং।

নিচে ধারাবাহিকভাবে ব্যায়ামগুলোর বর্ণনা করা হলো-

১। **পুশ আপ :** হাতের শক্তি বাড়ানোর জন্য এই ব্যায়াম করা হয়। মাটিতে দুই হাত সমানভাবে ভর দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীর সোজা রেখে উপরে ও নিচে নেওয়াকে পুশ আপ বলে।

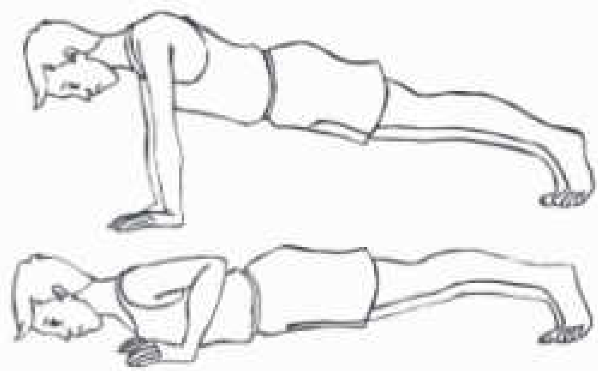

পুশ আপ

(ক) মাটির দিকে মুখ দিয়ে তালুর ওপর ভর রেখে শরীর সোজা রাখতে হবে।

(খ) কাঁধ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শরীর এক লাইনে থাকবে।

(গ) পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিতে হবে। গোড়ালি উঁচু থাকবে।

(ঘ) হাঁটু একত্র ও সোজা থাকবে।

যখন বলবে এক বা আপ তখন শরীর ওপরে উঠবে, দুই বা ডাউন বললে, শরীর নিচে যাবে। তবে শরীর মাটি স্পর্শ করবে না। এভাবে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়াম করাতে হবে।

কাজ–১ : পুশ আপের সময় হাত মাটিতে কীভাবে রাখতে হয়, শরীরের সঠিক অবস্থান মুখে বলো ও করে দেখাও।

কাজ–২ : হাঁটু কীভাবে থাকবে, পায়ের আঙুল ও গোড়ালি অবস্থান কেমন হবে দেখাও।

কাজ–৩ : শিক্ষার্থীরা গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করে দেখাও।

২। **সিট আপ :** পেটের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানো ও মেদ কমানোর জন্য এ ব্যায়াম খুবই উপকারী। মাটিতে বা ম্যাটে চিত হয়ে শুয়ে পা সোজা রেখে শরীরের উপরের অংশ ওপরে তোলা ও নিচে নামালোকে সিট আপ বলে। সিট আপ করার নিয়ম–

(ক) চিত হয়ে ম্যাটে শুতে হবে। দুই হাত মাথার নিচে থাকবে।

(খ) শরীর সোজা ও দুই পা ভাঁজ করে একত্রে থাকবে।

(গ) শরীরের ওপরের অংশ তুলে হাঁটুতে লাগানোর চেষ্টা করবে।

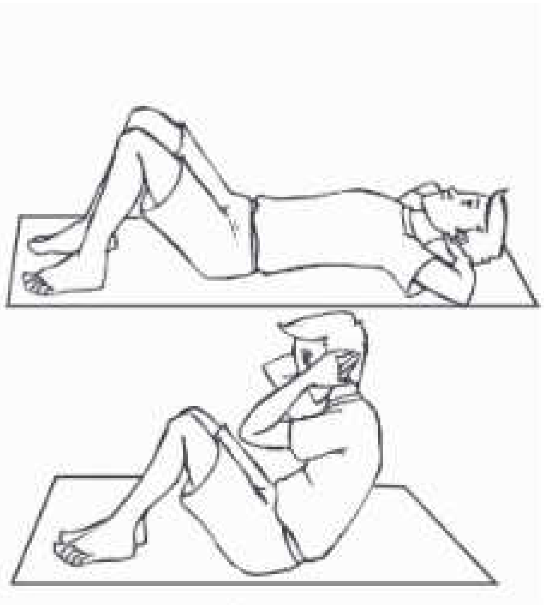

সিট আপ

শিক্ষকের সংকেতের সাথে সাথে হাত ওপরে তুলে সামনে ঝুঁকতে হবে। পরবর্তী সংকেতে মাথা নিচে যাবে। এভাবে ব্যায়ামটি অনুশীলন করতে হবে। কেউ না পারলে তার পায়ের পাতা মাটিতে চেপে ধরে রাখলে সহজে ব্যায়ামটি করতে পারবে। যারা ভালো পারবে তারা হাঁটু ভেঙেও করতে পারবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে শরীরে বা জামায় যেন মাটি না লাগে।

কাজ–১ : সিট আপ অনুশীলন করে দেখাও।

কাজ–২ : শরীরে মাটি না লাগার জন্য কী করতে হয়? দলে অনুশীলন কর।

৩। **স্পট জাম্প :** একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাফ দেওয়াকে স্পট জাম্প বলে। এই জাম্পে শরীরের শক্তি ও গতি বাড়ে। স্পট জাম্প দেওয়ার নিয়ম–

(ক) জাম্প পিটের কাছে একটি দাগ দিতে হবে। ওই দাগ অতিক্রম করা যাবে না।

(খ) দাগের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই পায়ের ওপর ভর করে সামনে লাফ দিতে হবে।

(গ) ল্যান্ডিং দুই পায়ে হবে।

শিক্ষার্থীদের এক লাইনে দাঁড় করাতে হবে। শিক্ষক সংকেত দিলে একজন একজন করে লাফ দেবে। ল্যান্ডিংয়ের জায়গায় বালু থাকবে। বালু বেশি শুকনা হলে পানি দিয়ে হালকা ভেজাতে হবে। পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাফ দেয়াকে 'টেক অফ' বলে। লাফ দিয়ে পড়ার জায়গাকে ল্যান্ডিং বলে।

কাজ–১ : কয় পায়ে টেক অফ নিতে হয়, দেখাও।

কাজ–২ : ল্যান্ডিং করে দেখাও।

কাজ–৩ : স্পট জাম্প দেওয়ার নিয়ম লিখ।

৪। **বডি বেন্ডিং ফরওয়ার্ড** (শরীর সামনে বাঁকানো) : এই ব্যায়াম শরীরের ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা বাড়ায়। হাঁটু সোজা রেখে দুই হাত সোজা উপরে তুলতে হবে এবং উভয় হাত যেন উভয় কানের কাছাকাছি থাকে। সেই অবস্থায় শরীর সামনে বাঁকিয়ে যতদূর সম্ভব হাত নিচের দিকে নিয়ে ঝুঁকতে হবে। এই ব্যায়াম করার নিয়ম–

(ক) ১৮″ - ২০″ উঁচু কাঠের বাক্স বা সিঁড়িতে দাঁড়াতে হবে।

(খ) দুই হাঁটু সোজা ও দুই হাত মাথার উপরে কানের কাছাকাছি লাগানো থাকবে।

(গ) আস্তে আস্তে শরীর সামনের দিকে বাঁকাতে হবে।

সংকেতের সাথে সাথে এই ব্যায়াম শুরু করবে। কখনই হাঁটু বাঁকা করা যাবে না। হাত দুটি কানের সাথে লাগিয়ে রাখতে হবে। আস্তে আস্তে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকতে হবে। কাঠের বাক্সে বা সিঁড়িতে ১″ পরপর দাগ দিতে হবে। যার হাত বেশি ইঞ্চি অতিক্রম করবে তার নমনীয়তা ভালো বলে গণ্য হবে।

কাজ–১ : বডি বেন্ডিং ফরওয়ার্ডের জন্য কিসের ওপর দাঁড়াতে হবে ব্যাখ্যা কর। হাত ও পায়ের অবস্থান কেমন হবে বর্ণনা কর।

কাজ–২ : কাঠের বাক্সে বা সিঁড়িতে ইঞ্চির দাগ কেন দেওয়া হয়? এই ব্যায়ামের ফলে শরীরের কী বাড়ে? ব্যাখ্যা কর।

৫। **হাফ সিটেড এলবো ব্যালান্স :** মাটিতে অর্ধ বসা অবস্থায় দুই হাত মাটিতে রেখে দুই কনুই ভেঙে দুই উরুর ভেতরে কনুই ঢুকিয়ে হাতের ওপর ভর করে শরীরের ভারসাম্য রাখাকে বোঝায়। এই ব্যায়াম হাতের শক্তি বৃদ্ধি ও শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ব্যায়াম করার নিয়ম–

ক) অর্ধ বসা অবস্থায় দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে।

খ) দুই কনুই ভেঙে দুই উরুর ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হবে।

গ) দুই হাতের ওপর রেখে দুই কনুইয়ের সাহায্যে শরীর উপরের দিকে তুলতে হবে। এভাবে ব্যায়ামটি করতে হবে।

কাজ–১ : হ্যাফ সিটেট এলবো ব্যালান্স এই ব্যায়ামটি তোমাদের কী উপকারে আসে? দুই হাত কোথায় রাখতে হয় বসে দেখাও। কনুই কীভাবে রেখে এ ব্যায়াম করবে, অনুশীলন করে দেখাও।

৬। **দৌড় :** শরীর সুস্থ রাখার জন্য দৌড় একটি উপকারী ব্যায়াম। যেকোনো খেলার আগে শরীর গরম করার জন্য দৌড় দিতে হয়। শিক্ষকের নির্দেশমতো কখনো আস্তে, কখনো জোরে দৌড়াতে হয়। শিক্ষার্থীদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দৌড়াতে বলবে। যেমন– ওই গাছ ছুঁয়ে আসো, ওই দেয়াল ছুঁয়ে আসো বা গোলপোস্ট ঘুরে দৌড়ে আসো। আবার দিক পরিবর্তন করেও দৌড় শেখানো যায়। যেমন– হাত দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন, ডান দিকে যাও, বাম দিকে যাও, পেছনে আসো, সামনে যাও। এভাবে অনুশীলন করাবেন। তবে লক্ষ রাখতে হবে দৌড়গুলো যেন শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের মধ্যে হয়। এ বয়সের শিশুদের দৌড় ৫০ গজের মধ্যে হলে ভালো হয়।

কাজ–১ : দৌড় আমাদের কী উপকারে আসে? দিক পরিবর্তন দৌড় কাকে বলে? দিক পরিবর্তন করে কীভাবে দৌড়ানো যায় করে দেখাও।

৭। **জাম্পিং (লাফ) :** এ লাফ প্রতিযোগিতামূলক লাফ নয়। শরীর গরম করার জন্য যে লাফ দেওয়া হয় বা দৌড়ে এসে জাম্প পিটে লাফ দিয়ে পড়াকে জাম্পিং বলে। শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক এক ফাইলে দাঁড় করাবেন। শিক্ষক সংকেত দিলে একজন একজন করে দৌড় দিয়ে এসে জাম্প পিটে লাফ দেবে। মনে রাখতে হবে, দূর থেকে দৌড়ে এসে লাফ দিলে গতি বাড়ে ও অনেক দূরে লাফ দেওয়া যায়। এভাবে সকলে লাফ অনুশীলন করবে। জাম্প পিটের মাটি যেন শক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কাজ–১ : দূর থেকে দৌড়ে এসে লাফ দিলে কী হয়? জাম্প পিটে পড়ার সময় এক পা মাটিতে পড়বে নাকি দুই পা একসাথে পড়বে বল? লাফ দিয়ে দেখাও।

নতুন শব্দ

১। পুশ আপ (Push up) : ভর দিয়ে শরীর উপরে-নিচে করা।

২। সিট আপ (Sit up) : শরীরের ওপরের অংশ উপরে-নিচে করা।

৩। বডি বেন্ডিং ফরওয়ার্ড (Body bending forward) : শরীর সামনে বাঁকানো।

৪। ম্যাট (Mat) : যার ওপর ব্যায়াম করলে ব্যথা পাওয়া যায় না। রাবার বা নারিকেলের ছোবড়া ভেতরে দিয়ে সেলাই করে নিতে হয়।

৫। জাম্প পিট (Jump pit) : লাফ দেওয়ার জায়গা।

৬। টেক অফ (Take off) : পায়ের ওপর ভর দিয়ে লাফ দেওয়া।

৭। ল্যান্ডিং (Landing) : দুই পায়ের ওপর পড়াকে ল্যান্ডিং বলে।

৮। এলবো (Elbow) : কনুই।

অনুশীলনী

১. খেলাধুলার মাধ্যমে অঙ্গ সঞ্চালনকে কী বলে?

ক. স্পিড　　খ. ব্যায়াম

গ. ওয়ার্ম আপ　　ঘ. শরীরে ক্লান্তি আনা

২. বডি বেন্ডিং ফরওয়ার্ড ব্যায়ামের নিয়মের অন্তর্গত কোনটি?

ক. ১৮"-২০" উঁচু কাঠের বাক্সতে দাঁড়ানো

খ. অর্ধ বসা অবস্থায় দুই হাত ও দুই পা মাটিতে রাখা

গ. পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য লাফ দেওয়া

ঘ. হাঁটু ভেঙে জাম্প পিটে লাফ দেওয়া

৩. প্রাত্যহিক সমাবেশের ধারাবাহিকতা কোনটি?

ক. জাতীয় পতাকা উত্তোলন → অভিবাদন → শপথ বাক্য পাঠ → জাতীয় সংগীত

খ. জাতীয় পতাকা উত্তোলন → জাতীয় সংগীত অভিবাদন → শপথ বাক্য

গ. জাতীয় সংগীত → শপথ বাক্য → পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ → অভিবাদন

ঘ. জাতীয় পতাকা উত্তোলন → পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ → জাতীয় সংগীত → শপথ বাক্য পাঠ

৪. প্রাত্যহিক সমাবেশে ফাইলের সংখ্যা নির্ধারিত হয় কিসের ভিত্তিতে?

ক. শিক্ষার্থীর সংখ্যা　খ. শিক্ষার্থীর উচ্চতা　গ. ছেলেমেয়ের ভিন্নতা　ঘ. খোলামেলা জায়গা

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সামির বয়স ১২ বছর। তার শরীরের মেদ বেড়ে গেলে শরীরচর্চা শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করে। শিক্ষক সামির শারীরিক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে তাকে এক ধরনের ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন।

৫. শিক্ষক সামিকে কোন ধরনের ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন?

ক. পুশ আপ খ. সিট আপ

গ. চিন আপ ঘ. ওয়ার্মিং আপ

৬. শিক্ষকের সামির জন্য ব্যায়াম নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় হলো-

i. উচ্চতা ও শারীরিক সামর্থ্য

ii. ওজন ও খেলাধুলার আগ্রহ

iii. বয়স ও উচ্চতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i ও ii ও iii

নিচের চিত্র দেখে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

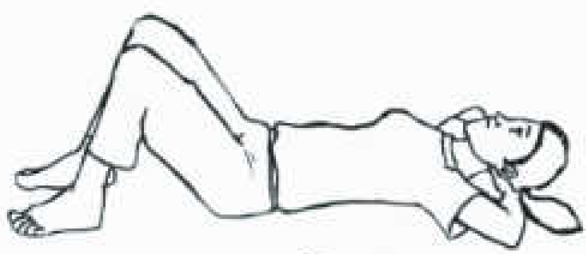

চিত্র
রিমা গালিচায় চিৎ হয়ে ব্যায়াম করছে

৭. রিমা কোন ধরনের ব্যায়াম করছে?

ক. পুশ আপ খ. সিট আপ

গ. স্পট জ্যাম্প ঘ. হাফ সিটেড এলবো

৮. রিমার অংশগ্রহণকারী ব্যায়ামের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. শরীর সোজা ও দুই পা একত্রে রেখে শরীরের উপরের অংশ উপরে নিচে তোলা

খ. হাঁটু একত্র ও সোজা রেখে মাথা বরাবর শরীর বাঁকানো

গ. অর্ধ বসা অবস্থায় দুই হাত মাটিতে রেখে ব্যায়াম করা

ঘ. দুই হাত মাথার উপরে কানের কাছাকাছি রাখা এবং শরীর বাঁকানো

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং

স্কাউটিং ও গার্ল গাইড বিশ্বব্যাপী একটি সমাজ সেবামূলক যুবআন্দোলন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্কাউটিং ও গার্ল গাইডের কার্যক্রম রয়েছে। সুস্বাস্থ্য অর্জন, চরিত্র গঠন ও মানসিক গুণাবলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে বালক-বালিকাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিং ও গার্ল গাইড আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। দেশ ও জাতির কল্যাণে স্কাউটিং ও গার্ল গাইড কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সবার সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

স্কাউট ও গার্ল গাইড

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর মাধ্যমে সৎ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ হব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধান/চিকিৎসার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ–১ : স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং একটি অরাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠন। বিশ্বব্যাপী এর পরিচিতি রয়েছে। বালকদের স্কাউট এবং বালিকাদের গাইড বলা হয়। রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিং ও গাইড আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতিতে ইংরেজ ও পেশায় সৈনিক ছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। স্কাউটিং ও গাইড পদ্ধতিতে বালক-বালিকাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে এর কার্যকর ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কাউটিং ও গার্ল গাইড আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গাইড আন্দোলনের জন্য তিনি তার বোন এগনেস ব্যাডেন পাওয়েল ও তার স্ত্রী অলিভ ব্যাডেন পাওয়েলকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তাঁরা গাইড আন্দোলনকে সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত করে সর্বত্র এর প্রসার ঘটান। বাংলাদেশে স্কাউটিং ও গার্ল গাইড কর্মসূচি চালু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরপর ১৯৭২ সালে। এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটানো এবং তাদেরকে সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে।

স্কাউট ও গার্ল গাইডগণ জনসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শ্লোগান প্রচার করা হয়। এই শ্লোগান হচ্ছে :-

'প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা।' যেমন :

১। রাস্তা থেকে ইট, পাথর, কাঁটা, কলার খোসা তুলে ফেলা।

২। কারো জিনিস পড়ে গেলে তা তুলে দেওয়া।

৩। অন্ধ ও শিশুকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা।

৪। রাস্তার কোনো ছোটো গর্ত ভরাট করে দিয়ে লোক চলাচলে সাহায্য করা।

৫। আহত ব্যক্তিকে দ্রুত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতালে নেওয়া।

৬। বন্যায় ত্রাণকাজে সহায়তা করা ইত্যাদি।

কাজ–১ : স্কাউটিং ও গার্ল গাইড কর্মসূচি জীবনে কেন প্রয়োজন? বর্ণনা কর।

কাজ–২ : সেবামূলক কাজ কী কী তার তালিকা তৈরি করে পোস্টার আকারে উপস্থাপন কর।

পাঠ–২ : স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর মূলমন্ত্র ও প্রতিজ্ঞা– স্কাউট ও গার্ল গাইডের সদস্য ব্যাজ পেতে হলে এ বিষয়ের মূলনীতি ও প্রতিজ্ঞা জানতে ও বুঝতে হয়। মূলমন্ত্র, চিহ্ন, সালাম এগুলো স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর সাধারণ বিষয়।

মূলনীতি :- স্কাউট আন্দোলন তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যথা :

১। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন।

২। অপরের প্রতি কর্তব্য পালন।

৩। নিজের প্রতি কর্তব্য পালন।

স্কাউটের প্রতিজ্ঞা : প্রত্যেক স্কাউটকে স্কাউট হিসেবে দীক্ষা নেয়ার সময় একটি প্রতিজ্ঞা নিতে হয়। প্রতিজ্ঞাটি হলো-

১। আল্লাহ্ ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন।

২। প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা।

৩। স্কাউট নীতিমালা মেনে চলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

স্কাউটিং এর আইন : স্কাউটিং আইন সুনাগরিক হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে। স্কাউটিং আইন অনুসরণে একটি বিস্তারিত নীতিমালা রয়েছে যা একজন স্কাউটকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। স্কাউটিংয়ের সাতটি আইনের প্রতিটির আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। যেমন–

১। স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। স্কাউট কখনোই তার আত্মমর্যাদা ভঙ্গ করে না।

২। স্কাউট সকলের বন্ধু। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্কাউট সকলকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে।

৩। স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সর্বদাই স্কাউটরা একে অপরকে সাহায্য ও বিনয় প্রদর্শন করে।

৪। স্কাউট জীবের প্রতি সদয়। একজন স্কাউট সাধ্যমতো প্রাণীদের কষ্ট লাঘব ও যন্ত্রণা হতে রক্ষা করবে।

৫। স্কাউট সদা প্রফুল্ল। স্কাউট সকল কাজকর্ম হাসিমুখে করে থাকে।

৬। স্কাউট মিতব্যয়ী। একজন স্কাউট কখনোই অপচয় করে না। সে মিতব্যয়িতার সাথে জীবন পরিচালনার অভ্যাস গড়ে তোলে।

৭। স্কাউট চিন্তায়, কথায় ও কাজে নির্মল। স্কাউটরা এমন কোনো কাজ করে না যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গার্ল গাইডের প্রতিজ্ঞা : আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করতেছি যে,

১। স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমি যথাসাধ্য আমার কর্তব্য পালন করিব।

২। সর্বদা পরের উপকার করিব।

৩। গাইডের নিয়মাবলি মানিয়া চলিব।

গার্ল গাইডের নিয়মাবলি : গার্ল গাইডদের জন্য ১০টি নিয়ম রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–

১। গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য।

২। গাইড বিশ্বস্ত।

৩। গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া ও অপরকে সাহায্য করা।

৪। গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগ্নি।

৫। গাইড মাত্রই বিনয়ী।

৬। গাইড জীবের বন্ধু।

৭। গাইড আদেশ পালন করে।

৮। গাইড হাসিমুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে।

৯। গাইড মিতব্যয়ী।

১০। গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় নির্মল।

স্কাউট ও গার্ল গাইডের মটো বা মূলমন্ত্র : স্কাউট ও গার্ল গাইডের মূলনীতি হলো **'সদা প্রস্তুত'**। প্রত্যেক স্কাউট ও গার্ল গাইড অপরের সেবার জন্য বা যেকোনো ভালো কাজ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। 'সদা প্রস্তুত' এর অর্থ হলো যেকোনো প্রয়োজনে অন্যকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। এর ইংরেজি হলো 'Be Prepared'।

স্কাউট চিহ্ন

স্কাউট ও গার্ল গাইডের চিহ্ন : ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙুলকে চেপে ধরে তালুর ওপর এনে মাঝখানের তিনটি আঙুলকে সোজা করে ধরতে হবে। তালু সামনের দিকে রেখে কনুই ভাঁজ করে হাত উপরে ওঠাতে হবে। হাত এমনভাবে রাখতে হবে যেন তালু প্রায় চোখ বরাবর থাকে। এ অবস্থাকে চিহ্ন বলে। চিহ্নের তিনটি আঙুলের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞার তিনটি বৈশিষ্ট্য এবং দুই আঙুলের বন্ধনে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়।

চিহ্নের ব্যবহার

ক) প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় চিহ্ন দেখাতে হয়।

খ) সাধারণ পোশাকে একজন গাইড/স্কাউটের সাথে অপর একজন গাইড/স্কাউটের পরিচিত হওয়ার জন্য এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ চিহ্ন দেখলেই বোঝা যাবে যে সে একজন স্কাউট বা গার্ল গাইড।

চিহ্নের তাৎপর্য : চিহ্নের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ডান হাতের কব্জি থেকে হাতের অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশকে সোনালি বন্ধন বা Golden tie বলে। হাতের মাঝের তিনটি আঙুল দ্বারা প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশকে বোঝায়। বুড়ো আঙুল ও কনিষ্ঠ আঙুলের বন্ধনের ফলে সৃষ্ট বৃত্ত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে বোঝায়।

সালাম : স্কাউট ও গার্ল গাইডরা তিন আঙুলে সালাম দেয়। ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল ভাঁজ করে হাতের তালুর ওপর নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে এবং বাকি তিনটি আঙুল একত্র করে সোজা অবস্থায় তর্জনী আঙুলের মাথা ডান চোখের ওপরে কপালের ভ্রুর এক কোণ স্পর্শ করবে। হাতের তালু সামনের দিকে এবং বাহু শরীরের সাথে ৯০° কোণ করে ধরতে হবে। এটি হচ্ছে স্কাউট ও গার্ল গাইডদের সালাম দেওয়ার পদ্ধতি বা নিয়ম।

করমর্দন : আগে বাংলাদেশের স্কাউট ও গার্ল গাইডদের বাম হাতে করমর্দন করার প্রচলন ছিল। পরবর্তী সময়ে দেশের ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ডান হাতে করমর্দন করার প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কাউট ডান হাতে করমর্দন বা হ্যান্ডশেক করে। বিশ্বের অনেক দেশে এখনো বাম হাতে করমর্দন করে থাকে। গাইডরা এখনো বাম হাতে করমর্দন করে।

করমর্দন

কাজ–১ : স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর মূলনীতিগুলো খাতায় লিখ।

কাজ–২ : স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং এর মূলমন্ত্র বা মটো, চিহ্ন, সালাম কীরূপ তা করে দেখাও? করমর্দন কীভাবে করবে তাও করে দেখাও।

কাজ–৩ : স্কাউট ও গার্ল গাইডিং এর প্রতিজ্ঞা ব্যাখ্যা কর। (বাড়ির কাজ)

কাজ–৪ : পোস্টার আকারে মূলনীতিগুলো লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৩ : স্কাউটিং ও গার্ল গাইডের কর্মসূচি ও পোশাক : গার্ল গাইডের আট দফা কর্মসূচি রয়েছে। এই আট দফা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে গাইডরা গাইডিং উপভোগ করে ও সর্বক্ষেত্রে নিজেদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলে। গাইডের প্রতিজ্ঞা ও মূলমন্ত্র রক্ষা করতে হলে এসব কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে তারা নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে।

আট দফা কর্মসূচি

১। চরিত্র গঠন।

২। নিজেকে জানা।

৩। সৃজনশীল ক্ষমতা অর্জন।

৪। পরস্পরকে জানা।

৫। সেবাব্রতে প্রস্তুত থাকা।

৬। গৃহকর্মে দক্ষতা অর্জন।

৭। বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ।

৮। শারীরিক উপযুক্ততা অর্জন।

এসব কর্মসূচির মাধ্যমে গাইডেরা নিজেদেরকে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। এগুলো সুমাতা, সুনাগরিক, স্রষ্টার প্রতি ভক্তি এবং অপরের মঙ্গলার্থে নিজের স্বার্থত্যাগের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। স্বাস্থ্যসম্মত ও আনন্দদায়ক কাজকর্মের মাধ্যমে গাইডিং মানসিক গুণাবলির বিকাশ ও চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করে। গাইডরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এই কর্মসূচি স্বাস্থ্য উন্নয়নে, সমাজসেবায় এবং হস্তশিল্পে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য পালিত হয়। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য গাইডদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। গাইডরা ক্যাম্পিং ও হাইকিংয়ের মাধ্যমে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করে এবং যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। গার্ল গাইডরা সমাজসেবামূলক কাজকর্মের দ্বারা দেশের দুর্যোগ যথা– বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে পারে। হস্তশিল্প, বুনন, সবজি বা ফুলের বাগান করা, অতিথি সেবা, রান্না করা ইত্যাদি কর্মসূচিতেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, খেলাধুলা, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গার্ল গাইড কর্মসূচিতে আছে। এই কর্মসূচি তিনটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা, দশটি নিয়মাবলির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

একজন গাইডকে সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গার্ল গাইড কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্ল গাইড অ্যাসোসিয়েশন সারা দেশে এর অঙ্গ শাখাসমূহের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

পোশাক : কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, ইউনিট লিডার, হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার এবং অন্যান্য সনদপ্রাপ্ত পদের অধিকারী স্কাউট/গাইড সদস্যগণ স্কাউট পোশাক পরে থাকে। পোশাক পরিধান ও ব্যবহারের মাধ্যমে গাইড/স্কাউটদের পরিচয় পাওয়া যায়। গাইড/স্কাউট পোশাক সঠিক মাপ ও নমুনার হতে হবে। বাংলাদেশ গাইড/স্কাউটস অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন ছাড়া ব্যাজ ও ডেকোরেশন পোশাকের ওপর পরা যাবে না।

স্কাউট পোশাক : ছেলে

১) **টুপি :** নেভি ব্লু রঙের টুপি।

২) **শার্ট :** ছাই (অ্যাশ) রংয়ের কাঁধে পেটিবিহীন দুই পকেটওয়ালা (ঢাকনাযুক্ত মাঝখানে প্লেটসহ) হাফ বা ফুল-হাতা শার্ট।

৩) **প্যান্ট :** গাঢ় নেভি ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট, স্ট্রেইট কাট, নিচের মুহরী ৪০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটারের এর মধ্যে হতে হবে।

৪) **বেল্ট :** বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মনোগ্রামযুক্ত কালো চামড়া বা নেভি ব্লু রঙের কাপড়ের বেল্ট।

৫) **জুতা :** কালো রঙের জুতা।

৬) **মোজা :** প্যান্টের সাথে মানানসই মোজা।

৭) **স্কার্ফ :** নিজ ইউনিটের জন্য থানা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮) **গ্রুপ পরিচিতি :** Oval বা ডিম্বাকৃতির সবুজ পটভূমিতে সাদা রংয়ের লেখা (স্ক্রিন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারি করা)। গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) **দড়ি :** এক সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সুতা/শন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে গোছানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

১০) **নামফলক :** হালকা নীল রঙের পটভূমিতে গাঢ় নীল রঙের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ লেখা কাপড়ের নিজ নামফলক ডান বুক পকেটে ঢাকনার লাইনের উপর পরতে হবে।

১১) **জাতীয় পতাকার রেপলিকা :** নামফলকের উপর জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

স্কাউট পোশাক : মেয়ে

১) **টুপি :** নেভি ব্লু রংয়ের পিকযুক্ত টুপি।

২) **কামিজ :** ছাই (অ্যাশ) রংয়ের লম্বা কামিজ (হাঁটুর ২"-০০ নিচ পর্যন্ত) ও গাঢ় নেভি ব্লু রঙের ওড়না।

৩) **পায়জামা :** গাঢ় নেভি ব্লু রঙের সালোয়ার/পায়জামা।

৪) বেল্ট : বাংলাদেশ স্কাউটস-এর মনোগ্রামযুক্ত কালো চামড়া বা নেভি ব্লু রঙের কাপড়ের বেল্ট।

৫) জুতা : কালো রঙের জুতা।

৬) মোজা : পায়জামার সাথে মানানসই মোজা।

৭) স্কার্ফ : নিজ ইউনিটের জন্য থানা স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত স্কার্ফ।

৮) গ্রুপ পরিচিতি : Oval বা ডিম্বাকৃতির সবুজ পটভূমিতে সাদা রঙে লেখা (স্ক্রিন প্রিন্ট/এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ কামিজের উভয় হাতার ওপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

৯) দড়ি : এক সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ২.৭৫ মিটার লম্বা সুতা/শন/পাটের দড়ি স্কাউটিং পদ্ধতিতে পেঁচানো অবস্থায় কোমরে বেল্টের হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

১০) নামফলক : হালকা নীল রঙের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ লেখা কাপড়ের নিজ নামফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেন্টিমিটার নিচে সেলাই করে পরতে হবে।

১১) জাতীয় পতাকার রেপলিকা : নামফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

গার্ল গাইডের পোশাক

১) কামিজ : সাদা কামিজ অন্তত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, ফুল হাতা, কাঁধের সোল্ডার ফ্ল্যাপ, সার্ট কলার দুইদিকে দু'টি বুক পকেট থাকবে। পকেটটি ত্রিকোনা ঢাকনাসহ হবে।

২) বেল্ট : সাদা

৩) সালোয়ার : সাদা,

৪) ওড়না : বটলগ্রিন।

৫) টাই : ত্রিকোণ বটলগ্রিন কাপড়ের,

৬) জুতা : সাদা অথবা কালো বন্ধ জুতা।

৭) মোজা : সাদা

৮) চুলের ফিতা : কালো (দুটি কলা বেণি হবে)।

পোশাকের যত্ন :

১) সব সময় পোশাকের যত্ন নিতে হবে। যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা যাবে না।

২) পোশাক ভাঁজ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) পোশাক সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ছিঁড়ে গেলে তাড়াতাড়ি সেলাই করে নিতে হবে। বোতাম খোলা রাখা যাবে না। ঠিকমতো লাগিয়ে রাখতে হবে।

৪) জুতা ময়লা হলে সাথে সাথেই পরিষ্কার করা এবং প্রয়োজনমতো ব্রাশ করে পরিষ্কার রাখতে হবে।

পোশাকের ব্যবহার

স্কার্ফ : "স্কাউট স্কার্ফ" স্কাউট পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি কাপড়ের তৈরি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আকৃতির। এটির বাহুর মাপ সাধারণত ৭৫ সেন্টিমিটার। পরিচয়ভেদে স্কার্ফ নানা রকম হতে পারে। স্কার্ফ কেবল স্কাউট ইউনিফর্মের সাথেই পরা যাবে।

স্কার্ফের উপকারিতা

১) প্রাথমিক প্রতিবিধানে ব্যান্ডেজের কাজে স্কার্ফ ব্যবহার করা যায়।

২) মাথায় টুপি না থাকলে রোদ/বৃষ্টিতে স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা যায়।

৩) বিপদে পড়লে সংকেত দেখার জন্য নিশান হিসেবে বা কয়েকটি স্কার্ফ একসাথে বেঁধে দড়ির কাজে ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহার বিধি : দৈর্ঘ্যের দিক থেকে জড়িয়ে স্কার্ফ তৈরি করে ঘাড়ের সাথে মিলিয়ে পরবে। স্কার্ফ অবশ্যই শার্টের কলারের ওপর পরতে হবে এবং কলারের বোতাম লাগিয়ে নিতে হবে। কোনো ক্রমেই কলারের নিচে টাই আকৃতিতে স্কার্ফ ব্যবহার করা যাবে না।

কাজ–১ : স্কাউট ও গার্ল গাইডের কর্মসূচি ও পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

কাজ–২ : স্কার্ফ ব্যবহারের উপকারিতা পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ :

ক্যাম্পিং - কোনো কর্মসূচি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় (তাঁবুতে) সম্মিলিতভাবে অবস্থান করাকে ক্যাম্পিং বলে।

হাইকিং - হাইকিং শব্দের অর্থ উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণ। পথ নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে স্কাউট ও গার্ল গাইডদের পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করাকে হাইকিং বুঝায়।

পাঠ–৪ : দড়ির প্রাথমিক ৬টি গেরো (Knot) : সদস্য ব্যাজের জন্য দড়ির ছয়টি গেরো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। দড়ি পাট, শন, নারকেলের ছোবড়া, নাইলন, স্টিল, লোহা, তামা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। সাধারণত পাট বা শনের পাকানো দড়ি ব্যবহার করা হয়। ছয়টি গেরো নিম্নরূপ :

১) ডাক্তারি গেরো (Reef Knot) : দুটি সমান মোটা দড়ির মাথা একটি ডান হাতে ও অপরটি বাম হাতে ধরে ডান হাতের দড়ির মাথার কাছে খানিক অংশ বাম হাতের দড়ির মাথার দিকে পাশাপাশি ধরে একটি প্যাঁচ দিতে হবে। এরপর দড়ির একটি অংশকে সেই অংশের মুল দড়ির পাশে রেখে অপর অংশটি দিয়ে পাশের অংশের সাথে প্যাঁচ দিতে হবে। এবার আস্তে আস্তে টেনে গেরো শক্ত করতে হবে। এভাবে ডাক্তারি গেরো বা রীফ নট বাঁধতে হয়। ডাক্তারি গেরো বা রীফ নট সাধারণত সমান মোটা দুটি দড়ি জোড়া দিতে, প্যাকেট বা ব্যান্ডেজ বাঁধতে ব্যবহার করা হয়।

ডাক্তারি গেরো

২) বড়শি গেরো (Clove Hitch) : দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে খুঁটিতে একটি পূর্ণ প্যাঁচ দিতে হবে। এই প্যাঁচ দেওয়ার ফলে দড়ির স্থির অংশে দড়ির চলমান অংশের নিচে অথবা উপরে থাকতে পারে। যদি দড়ির স্থির অংশে চলমান অংশের নিচে থাকে তাহলে দড়ির চলমান অংশে আগের তৈরি প্যাঁচের নিচ দিয়ে খুঁটিতে ঘুরিয়ে এনে দড়ির স্থির অংশের নিচ দিয়ে দ্বিতীয়বার তৈরি প্যাঁচের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দড়ির দুই প্রান্তকে টেনে শক্ত করতে হবে। এভাবে বড়শি গেরো (ক্লোভ হিচ) বাঁধতে হয়। সুতার মাথায় বড়শি বাঁধতেও এই গেরো ব্যবহার করা হয়।

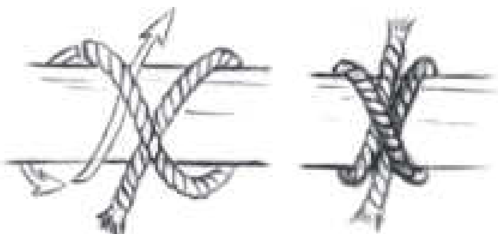

বড়শি গেরো

কাজ–১ : দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে এক গ্রুপ ডাক্তারি গেরো ও অপর গ্রুপ বড়শি গেরো করে দেখাও।

৩) পাল গেরো (Sheet Band) : একটি মোটা দড়ির এক প্রান্তে লুপ করে বাম হাতে ধরতে হবে। এবার ডান হাতে একটি সরু দড়ির প্রান্তভাগ মোটা লুপের নিচের দিক থেকে উপরে তুলতে হবে। তারপর মোটা দড়ির সাথে প্যাঁচ দিয়ে সরু দড়িটিকে তার নিচের লুপের মুল অংশের নিচে ঢুকিয়ে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে এ সময় সরু দড়ির প্রান্তটি যেন লুপের উপরে থাকে। এরপর সরু দড়ির স্থির অংশকে আস্তে আস্তে টানলে পাল গেরো বা শিট ব্যান্ড তৈরি হয়ে যাবে। মোটা দড়ির সাথে দড়ি বাঁধতে, নৌকার পাল বাঁধতে, পতাকার রশি ও পতাকা দণ্ডের রশি একত্রে বাঁধতে এই গেরো ব্যবহৃত হয়।

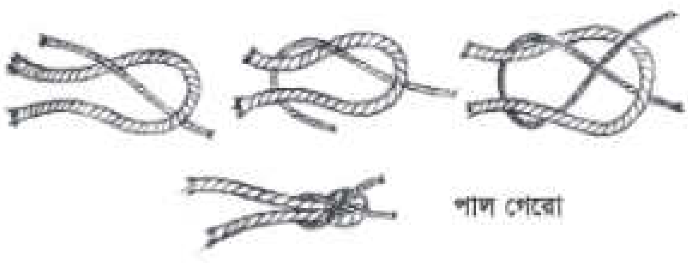

পাল গেরো

৪) জীবনরক্ষা গেরো (Bow Line) : দড়ির এক প্রান্তকে ডান হাত দিয়ে ধরে বাম হাতের তালুকে ওপরের দিকে রেখে দড়িকে বাম হাতের তালুর ওপর রাখতে হবে। দড়ির যে অংশে লুপ হবে সে পরিমাণে দড়িকে নিজের শরীরের দিকে টেনে আনতে হবে। শরীরের দিকে দড়ির যে অংশ আছে সেটি দড়ির চলমান অংশ। দড়ির চলমান অংশে দিয়ে হাতের তালুর ওপর এমনভাবে একটি লুপ তৈরি করতে হবে যেন লুপ তৈরির পর দড়ির চলমান অংশে দড়ির স্থির অংশের ওপর দিয়ে থাকে। এভাবে তৈরি লুপকে বাম হাতের মাধ্যমে বুড়ো আঙুল ধরতে হবে। বাম হাতের তর্জনী শরীরের সামনের দিকে বাড়িয়ে দড়ির স্থির অংশকে তর্জনীর উপর রাখতে হবে। এরপর দড়ির চলমান প্রান্তটি লুপের নিচ থেকে উপরের দিকে উঠিয়ে দড়ির চলমান প্রান্তকে দড়ির স্থির অংশের নিচ দিয়ে সরাসরি পুনরায় লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এখন লুপের মধ্যে দড়ির চলমান যে দুটি অংশ আছে সে দুটি অংশকে ডান হাতে ধরে দড়ির স্থির অংশ বাম হাতে ধরে টানলে তা হবে জীবনরক্ষা গেরো বা Bow Line। জীবন্ত কোনো লোককে উদ্ধারের জন্য যেমন- উপর থেকে নিচে নামানোর বা নিচ থেকে উপরে তোলার জন্য জীবনরক্ষা গেরো ব্যবহার করা হয়। তেমনি পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্যও এ গেরো ব্যবহৃত হয়।

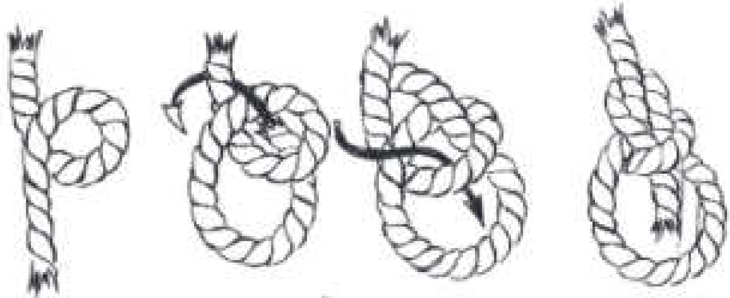

জীবনরক্ষা গেরো

> **কাজ–১ :** পাল গেরো দিয়ে দেখাও।
>
> **কাজ–২ :** জীবনরক্ষা গেরো কখন ব্যবহার করা হয় বর্ণনা কর।

৫) গুঁড়িটানা গেরো (Timber Hitch) : দড়ির চলমান প্রান্ত ডান হাতে রেখে চলমান অংশ দিয়ে গাছের গুঁড়ি বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে একবার প্যাঁচ দিতে হবে। এভাবে হাফ হিচ বা আলগা গেরো দেওয়া শেষ হলে দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে মূল দড়ির অংশে অন্ততপক্ষে ৫-৭ বার প্যাঁচাতে হবে। এভাবে গুঁড়িটানা গেরো বা টিম্বার হিচ বাঁধতে হয়। কোনো বোঝা বা ভারী গাছের টুকরা টেনে আনার জন্য গুঁড়িটানা গেরো ব্যবহার করতে হয়।

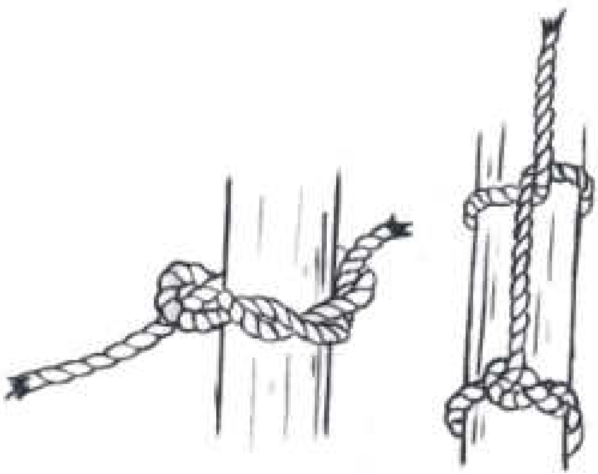

গুঁড়িটানা গেরো

৬) তাঁবু গেরো (Round Turn and Two Half Hitch) : দড়ির চলমান অংশ দিয়ে কোনো খুঁটিতে দুইবার প্যাঁচ দিতে হবে। খুঁটিতে দুইবার প্যাঁচ দেয়ার পর দড়ির দুই প্রান্তকে দুই হাতে ধরে চলমান প্রান্ত দিয়ে দড়ির স্থির অংশের অল্প দূরে দূরে দুটি হাফ হিচ বা আলগা গেরো দিতে হবে। এভাবে তাঁবু গেরো বাঁধতে হয়।

তাঁবু গেরো

কাজ –১ : তিন মিটারের দড়ি দিয়ে হাতে-কলমে গেরোগুলো বাঁধার নিয়ম করে দেখাও।

পাঠ–৫ : প্রাথমিক চিকিৎসা : প্রাথমিক চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অংশ। প্রাথমিক চিকিৎসার স্রষ্টা হলেন ড. ফ্রেডিক এজমার্ক। তিনি ছিলেন একজন জার্মান শল্যচিকিৎসক। তিনিই প্রথম চিন্তা করেন যেকোনো দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতএব প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ কোনো দৈব দুর্ঘটনায় ডাক্তার না আসা পর্যন্ত হাতের কাছের জিনিস দিয়ে রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা এবং রোগীর অবস্থা যাতে জটিলতর না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ফার্স্ট এইড (First Aid)। First অর্থ প্রথম আর Aid অর্থ সাহায্য। সুতরাং First Aid অর্থ প্রথম সাহায্য। কোনো আহত ব্যক্তিকে সবার আগে যে সাহায্য করা হয়, তা-ই প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর কাজ : প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর কাজ প্রধানত তিনটি। যেমন :

১) **রোগনির্ণয় :** কী কারণে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে তা খুঁজে বের করা। রোগের লক্ষণ, চিহ্ন বা ইতিহাস থেকে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

২) **চিকিৎসা :** কতটুকু চিকিৎসার প্রয়োজন তা নির্ণয় করে ডাক্তার আসার আগ পর্যন্ত যাতে রোগীর অবস্থার অবনতি না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩) **স্থানান্তর :** রোগীকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ

১) **ড্রেসিং :** ক্ষতস্থানকে জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাকে ড্রেসিং বলে।

২) **লিন্ট :** জীবাণুমুক্ত বা ওষুধযুক্ত একখণ্ড কাপড়ই লিন্ট।

৩) **প্যাড :** ক্ষতস্থানকে আরাম দেওয়ার জন্য যে গদি ব্যবহার করা হয় তাকে প্যাড বলে।

৪) **স্প্লিন্ট :** ভাঙা হাড়কে সোজা রাখার জন্য যে চটি ব্যবহার করা হয় তাকে স্প্লিন্ট বলে।

৫) ব্যান্ডেজ : লিন্ট, প্যাড বা স্প্লিন্ট যথাস্থানে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।
ব্যান্ডেজ দুই প্রকার : ক) রোলার ব্যান্ডেজ খ) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ।

কাটা : ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, দা, বটি প্রভৃতিতে দুর্ঘটনাবশত হাত-পা কেটে যেতে পারে। প্রথমেই আহত ব্যক্তির কোথায় কতটুকু কেটেছে তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১) সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করে কাটা স্থান পানি দিয়ে ধুয়ে তুলা বা কাপড় দিয়ে মুছতে হবে।

২) ক্ষতের চারপাশ ডেটল বা স্যাভলন বা অন্য কোনো জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৩) ক্ষতস্থানের জমাট বাঁধা রক্ত সরানো উচিত নয়। সরালে পুনরায় রক্তক্ষরণ হতে পারে।

৪) সামান্য ক্ষত হলে সরাসরি আঙুলের চাপ দিয়ে এবং বড় ধরনের ক্ষত হলে তুলা বা গজ দিয়ে চেপে ধরে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

পোড়া : আগুন, গরম পানি, জ্বলন্ত বস্তু ও গরম তরল পদার্থ থেকে দুর্ঘটনাবশত শরীরের কোনো অংশ পুড়ে গেলে পোড়া জায়গায় ঠান্ডা পানি বা ডিমের সাদা অংশ মাখিয়ে দিতে হবে। কোনো জায়গায় ফোস্কা দেখা দিলে ফোস্কা গলানো উচিত নয়। সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ছড়ে যাওয়া : হাতুড়ি, ইট, পাথর প্রভৃতি ভোঁতা জিনিসের আঘাতে বা জীবজন্তু কামড় দিলে শরীরের কোনো অংশ ছড়ে যেতে পারে। ফলে আহত স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে কালচে হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১) প্রথমেই আহত স্থানে ঠান্ডা পানি বা বরফ দিয়ে ব্যথা কমাতে হবে।

২) পরিষ্কার কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বরফ বা ঠান্ডা পানি লাগাতে হবে।

৩) আহত স্থানে কোনোরূপ ম্যাসাজ করা যাবে না।

৪) প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কাজ−১ : কেটে গেলে, পুড়ে গেলে, ছড়ে গেলে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় তা বর্ণনা কর। (বাড়ীর কাজ)

কাজ−২ : শিক্ষার্থীকে রোগী সাজিয়ে শিক্ষার্থী দ্বারাই প্রাথমিক চিকিৎসার অভিনয় করে দেখাও।

কাজ−৩ : ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে পোস্টার পেপারে চিকিৎসার বিধান তৈরি করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা' শ্লোগানটি কোন সংগঠনের?

ক. রেডক্রিসেন্ট খ. রোভার গাইড
গ. স্কাউটিং ঘ. ব্লু বার্ড

২. নিচ থেকে উপরে তোলার জন্য বা উপর থেকে নিচে নামানোর জন্য কোন গেরো ব্যবহার করা হয়?

ক. গুঁড়িটানা খ. জীবন রক্ষা
গ. পাল ঘ. তাঁবু

৩. কোন স্থান কেটে গেলে সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ কোনটি?

ক. লিন্ট, প্যাথিড্রিন, ব্লেড ও ডেটল খ. লিন্ট, প্যাড, স্প্লিন্ট ও ডেটল
গ. কাঁচি, ড্রেসিং, হাতুরি, ছুরি ও প্যাড ঘ.প্যাড, কাঁচি, বটি ও ব্লেড

৪. প্রাথমিক চিকিৎসায় আহত স্থানে বরফ ব্যবহৃত হয় কেন?

ক. ক্ষতস্থান বিশুদ্ধ করতে খ. রক্তপাত বন্ধ করতে
গ. ব্যথা কমানোর জন্য ঘ. ফোস্কা পড়া রোধে

৫. গাড়িতে সাভার থেকে ঢাকা আসার পথে তূর্যকে একটি গাছের বড়ো এক ডাল সরাতে হয়। তূর্য কোন গেরো বেঁধে গাছের ডালটি সরাবে?

ক. ডাক্তারি খ. গুঁড়িটানা
গ. তাঁবু ঘ. বড়শি

৬. দেওয়ালে পেরেক মারার সময় হাতুড়ির আঘাতে শিহাবের আঙুল থেতলে যায়। শিহাবের জন্য কোন প্রাথমিক চিকিৎসাটি প্রযোজ্য?

ক. জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা খ. ঠান্ডা পানিতে স্থানটি ভেজানো
গ. সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা ঘ. ক্ষত স্থানে গদি/প্যাড ব্যবহার করা

নিচের উদ্দীপকের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চিত্র : ১

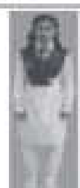

চিত্র : ২

শ্লোগান -
সদা প্রস্তুত

চিত্র : ৩

২০২৫

৭. উদ্দীপকের ২ নং চিত্রে ব্যবহৃত প্রতীকটি কোন সংগঠনের?

ক. বুলবুল / ব্লু বার্ড   খ. রোভার

গ. স্কাউট   ঘ. গার্ল গাইড

৮. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো -

i. প্রতীকগুলোর সবগুলোই ছেলেদের সংগঠনের

ii. চিত্র -১ এর চিহ্নটি ছেলে মেয়ে উভয় সংগঠনের

iii. চিত্র -৩ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনের মূলমন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২০২৩

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা

সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়সমূহকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলে। স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি? শারীরিক সুস্থতা বা শরীরের নীরোগ অবস্থাকে স্বাস্থ্য বোঝায়। বিশদ অর্থে শারীরিক সুস্থতাই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, এর সাথে মানসিক সুস্থতাও প্রয়োজন। সুস্থ থাকতে হলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো সবার মেনে চলা উচিত। শরীরকে শক্ত ও সতেজ রাখতে হলে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপন এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা বলতে মূলত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ইত্যাদি বোঝায়।

চিকিৎসামূলক স্বাস্থ্যসেবা

পরামর্শমূলক স্বাস্থ্যসেবা

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ সংক্রামক রোগের লক্ষণ দেখে রোগ চিহ্নিত করতে পারব।
- রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন মাধ্যম, রোগের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ–১ : স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা : স্বাস্থ্যের মতো মূল্যবান সম্পদ লাভ করতে হলে আমাদেরকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হবে। আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব থাকবেই। এই প্রভাব কী তা আমাদের বুঝতে হবে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কীভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, একজনের দেহ থেকে সংক্রামক ব্যাধি কীভাবে অন্যের দেহে সংক্রমণ ঘটায় এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ, সুষম খাদ্য, মলমূত্র ও আবর্জনা দূরীকরণ ব্যবস্থাও প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পাঠের উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ও রোগ প্রতিরোধ করা।

দেহ নীরোগ ও সুস্থ থাকলে তাকেই সুস্বাস্থ্য বলে। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষাই যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু স্বাস্থ্যব্যবস্থা। একটি সুন্দর ও আনন্দময় জীবনযাপনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত শরীর সুস্থ রাখা। শৈশব থেকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে মানুষ সুখে, শান্তিতে ও আনন্দে জীবনযাপন করতে পারে। আর সুস্বাস্থ্যই মানুষকে করতে পারে সুখী। শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে মন ভালো থাকবে না। আর মন ভালো না থাকলে পড়াশোনায় মন বসবে না। অতএব, প্রত্যেকের প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি উপায় দেওয়া হলো–

১। নিয়মিত গোসল করা।

২। সময়মতো চুল ছাঁটা।

৩। সপ্তাহে একবার হাত ও পায়ের নখ কাটা।

৪। যেকোনো কাজ করার পর ভালোভাবে হাত ধোয়া।

৫। যেকোনো কিছু খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।

৬। পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি পান করা।

৭। নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

৮। যেখানে-সেখানে থুথু ও আবর্জনা না ফেলা।

৯। মলমূত্র ত্যাগের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

১০। দাঁত দিয়ে নখ না কাটা।

১১। পায়খানা করার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া।

১২। দাঁত পরিষ্কার করা।

তাছাড়া সব সময় সোজা হয়ে বসা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো, শরীর সোজা রেখে হাঁটা ও শোয়া ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচি

১। শ্রেণিকক্ষে স্বাস্থ্য সম্পর্কে পাঠদান।

২। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বক্তৃতাদান ও আলোচনা।

৩। স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

৪। স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ।

৫। গ্রন্থাগারে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত চিত্র, পুস্তক, চার্ট ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা।

৬। গণমাধ্যমে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্মসূচি প্রচারের ব্যবস্থা।

১। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কয়েকটি উপায় দিয়ে নিচের ছকটি পূরণ কর।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

২। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যরক্ষায় তুমি কী কী কাজ করো অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ–২ : সাধারণ সংক্রামক রোগ : সুস্থ থাকতে হলে আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত। কিন্তু তারপরও আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হই। রোগ বা অসুখ জীবনের একটি অংশ। সারাজীবন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে রোগকে এড়ানো ও প্রতিরোধ করা যায়। রোগের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানা দরকার।

কোনো কোনো রোগ রোগীর কাছ থেকে অন্যদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগকে বলে সংক্রামক রোগ। যেমন– ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, উদরাময়, হেপাটাইটিস (জন্ডিস), চোখ ওঠা, সর্দি, কাশি, যক্ষা, টাইফয়েড, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, এইডস প্রভৃতি সংক্রামক রোগের উদাহরণ। মানুষের শরীর ছাড়াও কোনো বস্তুর মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে।

সংক্রামক রোগকে অনেক সময় ছোঁয়াচে রোগ বলা হয়। তবে সব সংক্রামক রোগ ছোঁয়াচে নয়। যেমন– যক্ষা, টাইফয়েড, হাম, ম্যালেরিয়া, এইডস প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হলেও ছোঁয়াচে নয়। যেসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত হয় সেসব রোগকে ছোঁয়াচে রোগ বলে। যেমন– বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। যেসব রোগ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির শরীরে সঞ্চারিত হয় না, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি একাই রোগ বহন করে, এসব রোগকে সংক্রামক রোগ বলে না। যেমন– ক্যান্সার, প্যারালাইসিস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। যেসব রোগজীবাণু পানির মাধ্যমে ছড়ায়, সেসব রোগকে পানিবাহিত রোগ বলে। যেমন– টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরা, আমাশয়, ডায়রিয়া ইত্যাদি। কিছু কিছু রোগজীবাণু বায়ুর মাধ্যমে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে এগুলোকে বায়ুবাহিত রোগ বলে। যেমন– যক্ষা, জলবসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। অনেক রোগজীবাণু কীটপতঙ্গের দংশনের ফলে দেহে প্রবেশ করে। যেমন– স্ত্রী এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর এবং স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়।

বসন্ত : বসন্ত দুই প্রকার। গুটিবসন্ত ও পানিবসন্ত বা জলবসন্ত। গুটিবসন্ত বর্তমানে দেখা যায় না। অনেক আগেই পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। তবে পানিবসন্ত এখনো বিদ্যমান।

পানিবসন্ত বা জলবসন্ত : পানিবসন্ত বা জলবসন্ত একটি বায়ুবাহিত সংক্রামক রোগ। এ রোগ স্পর্শ দ্বারা, কাশির সময়, কফের দ্বারা, লালা দ্বারা, কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্রের সংস্পর্শ দ্বারা এবং বায়ু দ্বারা শরীরে সংক্রমিত হয়।

প্রতিকার

১. রোগীর সংস্পর্শে না আসা।

২. রোগীর ঘরে যাতে মাছির উপদ্রব না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।

৩. রোগীকে মশারির মধ্যে রাখা।

৪. রোগীর কাপড়-চোপড় ফুটন্ত গরম পানিতে ভালো করে ধুয়ে ডেটল পানিতে বিশোধন করা।

৫. থুথু, লালা, ফোস্কা পুড়িয়ে ফেলা।

৬. রোগীকে আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা।

৭. রোগীর ঘরে ফিনাইল ছিটিয়ে মাছির উপদ্রব কমানো।

৮. রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৯. সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে রোগীর সেবা করা, যেমন- নাকে মাস্ক ব্যবহার, সাবান দিয়ে হাত-মুখ ভালোভাবে ধোয়া, সেবা শেষে নিজের জামাকাপড় বদলিয়ে ফেলা ইত্যাদি।

চর্মরোগ : শরীর ও কাপড়-চোপড় অপরিষ্কার রাখলে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়। সর্বদা বাইরের ধুলাবালি ও ময়লা প্রভৃতি এসে শরীরের লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দেয়, ফলে বিভিন্ন চর্মরোগ হয়। খেলাধুলা শেষে বা কোনো কাজ করার পর শরীর ঘেমে গেলে তা যদি পরিষ্কার করা না হয় তাহলেও চর্মরোগ হতে পারে। যেমন- খোস-পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি।

প্রতিকার–

১. সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

২. কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা।

৩. ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ প্রতিদিন সাবান/সোডা/ক্ষার মিশ্রিত গরম পানিতে সিদ্ধ করে ধুয়ে ফেলা।

৪. রোগীর ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় ব্যবহার না করা।

৫. রোগীকে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়া।

কাজ–১ : তোমাদের এলাকায় গত ছয় মাসে যেসব সংক্রামক রোগ ছড়িয়েছে সেসব রোগের নাম ও লক্ষণসমূহ নিচের ছকে লিখ।

সংক্রামক রোগের নাম	সংক্রামক রোগের লক্ষণ
ক.	
খ.	
গ.	

কাজ–২ : চর্মরোগের প্রতিকার ১০ লাইনে লিখ। (বাড়ির কাজ)

পাঠ–৩ : সংক্রামক রোগের লক্ষণ ও মাধ্যম : তোমরা পঞ্চম শ্রেণিতে ডায়রিয়া, আমাশয়, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, জ্বর ইত্যাদি রোগের লক্ষণ ও মাধ্যম জেনেছ। আজ আমরা আরো বিস্তারিতভাবে জানব। নিচে কয়েকটি সংক্রামক রোগের লক্ষণ এবং এগুলো কীভাবে ছড়ায় তা বর্ণনা করা হয়েছে-

সর্দিজ্বর (Influenza) : সর্দিজ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে রোগজীবাণু বায়ুবাহিত হয়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। রোগীর দেহের সাথে সরাসরি সংস্পর্শে যেমন– আক্রান্ত ব্যক্তি ছোটো শিশুকে আদর করে চুমু খেলে শিশু আক্রান্ত হতে পারে। হালকা জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, মাথা ও শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, গলা খুসখুস ও ব্যথা করা, ক্লান্তিভাব প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ।

যক্ষ্মা (Tuberculusis) : এটি একটি জীবাণুঘটিত রোগ। ক্ষুধামন্দা, দুর্বল বোধ, দ্রুত ওজন হ্রাস, জ্বর ইত্যাদি যক্ষ্মার লক্ষণ। ফুসফুসের যক্ষ্মার ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা ও কাশি হয়। কাশির সাথে রক্ত উঠে আসতে পারে। এই যক্ষ্মা প্রতিরোধের জন্য টিকার ব্যবস্থা আছে।

যক্ষ্মা রোগীর হাঁচি ও কাশি থেকে জীবাণু বাতাসের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। খাদ্যের মাধ্যমেও যক্ষ্মার জীবাণু ছড়াতে পারে। যক্ষ্মা সাধারণত ফুসফুসকে আক্রমণ করে। তবে মস্তিষ্ক, বৃক্ক, অন্ত্র এবং হাড়েও যক্ষ্মা হতে পারে।

টাইফয়েড (Typhoid) : ডায়রিয়া ও কলেরার মতো টাইফয়েড একটি পানিবাহিত সংক্রামক রোগ। শরীর ও মাথাব্যথা, প্রচণ্ড জ্বর, ক্লান্তি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। টাইফয়েড রোগীর মলমূত্রের মধ্যে টাইফয়েড জীবাণু থাকে। এই মলমূত্র দ্বারা পানি দূষিত হলে টাইফয়েড রোগের সংক্রমণ ঘটে।

হাম (Measles) : হাম একটি ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত ছোটো শিশু ও বালক-বালিকাদের এ রোগ দেখা দেয়। হামে আক্রান্ত শিশুদের প্রচণ্ড জ্বর হয়, মুখ, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশে লালচে দানা দেখা যায়, নাক দিয়ে অনর্গল পানি পড়ে। চোখ লাল হয় ও কাশির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু অন্যের দেহে প্রবেশ করে।

ম্যালেরিয়া (Malaria) : ম্যালেরিয়া একটি সংক্রামক রোগ। শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসা, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া এ রোগের লক্ষণ। অ্যানোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশা ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। এই মশা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পর সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

এইডস (AIDS) : এইডস একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এই ভাইরাসের নাম HIV (Human Immunodeficiency Virus)। কোনো ব্যক্তির শরীরে HIV সংক্রমণ ঘটলে তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকে। এর ফলে অন্য কোনো রোগ ওই ব্যক্তিকে অতি সহজেই আক্রমণ করে। এ অবস্থাকে বলে AIDS (Acquired Immun Deficiency Syndrome)। এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো চিকিৎসাই এখন পর্যন্ত বের হয়নি। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের সুচ অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে, HIV আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খেলে বা HIV আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের যেকোনো তরল অংশ অন্যের শরীরে প্রবেশ করলে HIV হতে পারে।

জন্ডিস (Jaundice) : জন্ডিস ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। জন্ডিসে আক্রান্ত ব্যক্তির চোখের সাদা অংশে, পায়ের চামড়া ও প্রস্রাব হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পেটে ব্যথা ও জ্বর হতে পারে। খাদ্যে রুচি থাকে না এবং বমি হতে পারে। রোগের মাত্রা বেশি হলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। রোগীর মূত্র, থুতু, লালা, বুকের দুধ, মল ইত্যাদিতে হেপাটাইটিস ভাইরাস থাকে। সাধারণত খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

ডিপথেরিয়া (Diphtheria) : শিশুদের আরেকটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ হচ্ছে ডিপথেরিয়া। যথাসময়ে চিকিৎসা না হলে এটি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। জ্বর, গলা ব্যথা এবং গলা ফুলে গিয়ে খাবার খেতে অসুবিধা হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বা শিশুর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ও বাতাসের সাহায্যে ডিপথেরিয়া রোগের জীবাণু অন্যের শরীরে প্রবেশ করে।

পোলিও (Poliomyelitis) : এটি শিশুর একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত শিশু পঙ্গু হয়ে যায় এবং সারা জীবন এই পঙ্গুত্ব বয়ে বেড়াতে হয়। এতে প্রথমে জ্বর হয়, পরবর্তী পর্যায়ে মাথা ব্যথা করে। শিশুর ঘাড় শক্ত হয়ে যায় এবং হাত-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। শিশু দাঁড়াতে পারে না, পরে পঙ্গু হয়ে পড়ে। পোলিওর জীবাণু নাক-মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। সংক্রমিত ব্যক্তির মলের মাধ্যমে এই জীবাণু ছড়ায় ও অন্যকে সংক্রমিত করে।

কাজ–১ : রোগ সংক্রমণের মাধ্যম লিখে ছকটি পূরণ কর।

রোগের নাম	সংক্রমণের মাধ্যম
ক. ম্যালেরিয়া	
খ. হাম	
গ. টাইফয়েড	
ঘ. এইডস	

কাজ–২ : প্রত্যেকে তিনটি রোগের লক্ষণের তালিকা তৈরি কর।

পাঠ–৪ : সংক্রামক রোগের কারণ ও ফলাফল : জীবাণুর সংক্রমণের কারণে অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। আমাদের চারপাশে নানা রকমের জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন রোগের জীবাণু প্রতিনিয়ত মানুষের দেহে প্রবেশ করে। তবে রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করলেই যে সে রোগে আক্রান্ত হবে এমন নয়। জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের শরীরেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে। শরীরে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্ট

শক্তিশালী না হলে রোগজীবাণু জয়ী হয়। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অপরদিকে যার শরীর সবল ও মজবুত, রোগজীবাণু তার শরীরে প্রবেশ করলেও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা জীবাণুকে ধ্বংস করে। জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না।

লক্ষ-কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে জীবাণুর অস্তিত্ব ছিল। তবে সকল জীবাণুই যে শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা নয়। কোনো কোনো জীবাণু মানবদেহের জন্য উপকারী।

সংক্রামক রোগকে আমরা অণুজীবঘটিত রোগও বলতে পারি। সংক্রামক নামকরণ এই জন্য হয়েছে যে এই রোগগুলো এক ব্যক্তির বা প্রাণীর দেহ থেকে বিভিন্ন উপায়ে অন্য ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ বিভিন্ন রকম। কতকগুলো রোগ আছে অল্প সময়ের মধ্যে মহামারি আকার ধারণ করে। যেমন– কলেরা, বসন্ত, ডায়রিয়া, চোখের প্রদাহ ইত্যাদি।

সংক্রামক রোগের উৎস : সংক্রামক রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে একটা চেইন বা শিকল আছে। এই শিকলের তিনটি অংশ-

i) রোগের উৎস।

ii) রোগ বিস্তারের মাধ্যম।

iii) রোগ সংক্রমিত হতে পারে এমন সম্ভাবনাময় ব্যক্তি।

সংক্রামক রোগ বিস্তারের কারণ : সংক্রামক রোগের বিস্তারকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে–

ক) প্রত্যক্ষ স্পর্শ

খ) পরোক্ষ স্পর্শ

ক) প্রত্যক্ষ স্পর্শ

i) **সরাসরি স্পর্শ :** রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সরাসরি দৈহিক সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এ রোগ অন্যের দেহে প্রবেশ করে। যেমন– এইডস (AIDS), বিভিন্ন চর্ম ও চোখের রোগ।

ii) **ড্রপলেট ইনফেকশন :** রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে নাক-মুখ দিয়ে যেসব ক্ষুদ্র জলবিন্দু বেরিয়ে আসে সেগুলোকে বলা হয় ড্রপলেট। যেমন– সর্দি, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি এভাবে ছড়ায়।

iii) **সংক্রমিত মাটির মাধ্যমে :** মাটির সাথে দেহের কোনো ক্ষুদ্র স্থানের সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে কিছু রোগ বিস্তার লাভ করে। যেমন– টিটেনাস, হুক ওয়ার্ম ইত্যাদি।

iv) **জীবজন্তুর কামড় :** জীবজন্তুর কামড়েও বিভিন্ন রোগ সংক্রমিত হয়। যেমন– পাগলা কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক এবং ইঁদুরের কামড় থেকে প্লেগ।

খ) পরোক্ষ স্পর্শ বা বিস্তার

i) **বাহনবাহিত :** বাহনবাহিত বলতে এখানে খাদ্য, পানি, দুধ, রক্ত, বরফ ইত্যাদিকে বোঝায়। এই সব পদার্থকে আশ্রয় করে বিভিন্ন রোগ সংক্রমিত হয়। যেমন– পানি ও খাদ্যের মাধ্যমে ডায়রিয়া, রক্তের মাধ্যমে হেপাটাইটিস 'বি', ম্যালেরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি রোগ ছড়ায়।

ii) ভেক্টর বোর্ন (Vector Borne) : ভেক্টর বলতে জীবন্ত প্রাণী যেমন– মাছি, মশা, আরশোলা ইত্যাদি দ্বারা বাহিত রোগকে বোঝায়।

iii) বায়ুবাহিত (Air Borne) : বায়ুবাহিত রোগ যেমন যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জলবসন্ত, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

iv) অপরিষ্কার হাত : অপরিচ্ছন্ন হাত ও আঙুল সংক্রামক রোগ বিস্তারের একটি সহজ মাধ্যম। এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও প রাক্ষভাবে রোগ সংক্রমিত হয় যেমন– টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি।

v) ইনজেকশনের সূচ ও ব্লেড : ইনজেকশনের সূচ ও ব্লেডের মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ বিস্তার লাভ করে।

কাজ–১ : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রোগবিস্তারের একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ–২ : সংক্রামক রোগের উৎসগুলো পোষ্টার পেপারে লিখ। (বাড়ির কাজ)

কাজ–৩ : পোস্টার আকারে সংক্রামক রোগের নাম লিখে টাঙিয়ে দাও।

পাঠ–৫ : সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ : সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে বড়ো উপায় হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সকল উপায় অবলম্বন করা। শরীর সুস্থ ও সবল থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও দৃঢ় থাকে। এতে বাইরে থেকে রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশে বাধা পায়। কোনো রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেও প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে পারে না। ফলে রোগজীবাণু আক্রমণ করতে পারে না। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'Prevention is better than cure' অর্থাৎ আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন

১। টিকা গ্রহণ : যেসব রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক টিকা রয়েছে শিশু ও বয়স্কদের যথাসময়ে সেই টিকা নিতে হবে। যদি কোনো রোগের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একাধিক বার টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সে ব্যবধান মেনে নিয়মিত টিকা নিতে হবে। ঘরে পোষা পশুপাখি থাকলে তাদেরও নির্দিষ্ট সময়ে টিকা দিতে হবে। আমাদের দেশে যেসব রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলো হলো– বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হিমোফাইলাস, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, হাম, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস 'বি', জলবসন্ত, জরায়ু মুখের ক্যান্সার ইত্যাদি।

২। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : নিজ শরীর, পোশাক, আসবাবপত্র, রান্নার তৈজসপত্র, বাসন-কোসন, বসবাসের স্থান, বাথরুম, বসতবাড়ির চারপাশ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। হাত ধোয়ার অভ্যাস করা

- পায়খানা-প্রস্রাবের পর সাবান বা ছাই দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া।
- খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে হাত ধোয়া।
- খাদ্য গ্রহণের আগে ও পরে হাত ধোয়া।
- হাত দিয়ে কোনো কিছু পরিষ্কার করার পর হাত ধোয়া।
- অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া।
- পোষা পশুপাখির সাথে খেলা করা, তাদের ধরা অথবা গোসল করানোর পর ভালোভাবে হাত ধোয়া।
- প্রতিবার বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর হাত ধোয়া।

৪। খাদ্য প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশনে সতর্কতা

- খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে ও পরে হাত ধোয়া।
- খাবার না খাওয়া পর্যন্ত গরম খাদ্যকে গরম এবং ঠান্ডা খাদ্যকে ঠান্ডা রাখা।
- রান্নাঘরে মাছ-মাংস ও শাক-সবজি কাটার স্থান, তৈজসপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের পর গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে রাখা।
- রান্না ও খাওয়ার আগে হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন পরিষ্কার রাখা।
- টাটকা ফল ও সবজি খাওয়ার আগে নিরাপদ পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া।
- শস্য, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ঠিকমতো সিদ্ধ করে খাওয়া।
- খাওয়া শেষ হওয়ার পরপর উদ্বৃত্ত খাদ্য ভালোভাবে সংরক্ষণ করা।
- খাবার সবসময় ঢেকে রাখা।

৫। সকল বন্য ও গৃহপালিত পশুপাখির বিষয়ে সাবধানতা : যেকোনো প্রাণী কামড়ালে ক্ষতস্থান সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে মুরগির খামারে কাজ করার পর বা জীবন্ত মুরগি ধরার পর হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুতে হবে।

৬। কীট-পতঙ্গের কামড় এড়িয়ে চলা : যেখানে মশা বা অন্যান্য কীট-পতঙ্গ খুব বেশি, এমন এলাকায় গেলে বা অবস্থান করলে অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। বন-জঙ্গলে গেলে বা ভ্রমণ করার সময় কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সাবধান থাকতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিরোধক মলম ব্যবহার করতে হবে।

৭। জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করা : পানি অনেক রোগের বাহক। স্বাস্থ্যের জন্য জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি পান করা দরকার। সাধারণ ব্যবহারের পানি যেমন– গোসল করা ও কাপড় ধোয়ার পানিও পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দিনে ৮-১০ গ্লাস পানি পান করা উচিত। তবে এই পানি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। টিউবওয়েলের পানি, ফোটানো পানি বা ফিল্টার করা পানি সাধারণত নিরাপদ ও জীবাণুমুক্ত।

নিরাপদ পানি

৮। **আত্মসচেতনতা সৃষ্টি :** রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের একটি কার্যকর উপায় আত্মসচেতনতা সৃষ্টি। আত্মসচেতনতার উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- নিজ শরীর সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা।
- নিজ শক্তি-সামর্থ্য এবং দুর্বলতা সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা।
- শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং দুর্বলতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া।
- নিজ অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন থাকা।
- নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা।
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা এবং এ বিষয়ে সচেতন থাকা।
- নিজের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, ত্রুটি ইত্যাদি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এগুলো দূর করতে পারলে কোনো রোগ সহজে আক্রমণ করতে পারে না।

কাজ–১ : নিচের ছকে রোগের নাম দেওয়া আছে। রোগের মাধ্যম লিখে ছকটি পূরণ কর।

রোগের নাম	মাধ্যম
১। সর্দি জ্বর	১।
২। যক্ষ্মা	২।
৩। টাইফয়েড	৩।
৪। হাম	৪।
৫। ডিপথেরিয়া	৫।

কাজ–২ : হাত ধোয়ার কাজগুলো পোস্টারে লিখে উপস্থাপন কর। (শ্রেণির জন্য)

কাজ–৩ : ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে ৩টি করে আত্মসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়গুলো লিখ এবং উপস্থাপন কর। (দলগত কাজ)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেহ নিরোগ ও সুস্থ থাকাকে কী বলে?

ক. সুস্বাস্থ্য   খ. স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
গ. চিকিৎসা ব্যবস্থা   ঘ. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

২. নিচের কোনটি ছোঁয়াচে রোগ?

ক. ম্যালেরিয়া   খ. ইনফ্লুয়েঞ্জা
গ. প্যারালাইসিস   ঘ. টাইফয়েড

৩. কোনটি সংক্রামক রোগ বিস্তারের পরোক্ষ কারণ?

ক. ড্রপলেট ইনফেকশন   খ. জীবজন্তুর কামড়
গ. ভেক্টর বোর্ন   ঘ. সরাসরি স্পর্শ

৪. নিচের কোনটি বায়ুবাহিত রোগ?

ক. নিউমোনিয়া   খ. টিটেনাস
গ. হাম   ঘ. প্লেগ

৫. 'আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো'-প্রবাদটিতে নিচের কোনটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. রোগ হতে আরোগ্য লাভ   খ. রোগীর সঠিক পরিচর্যা
গ. রোগ পরবর্তী সতর্কতা   ঘ. রোগ পূর্ব সতর্কতা

৬. হুক ওয়ার্ম রোগ হবার প্রধান কারণ কোনটি?

ক. পাগলা কুকুরের কামড়   খ. ইঁদুরের কামড়
গ. অ্যানোফিলিস মশার কামড়   ঘ. মাটির সাথে দেহের ক্ষত স্থানের সংস্পর্শ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গুচ্ছ-A	গুচ্ছ-B	গুচ্ছ-C
• শরীর কাঁপিয়ে জ্বর	• প্রচণ্ড জ্বর	• দ্রুত ওজন হ্রাস
• শ্বাস কষ্ট	• দেহে লালচে দানা	• বুকে ব্যথা
• মাথা ব্যথা	• চোখ লাল	• কাশির সাথে রক্ত যাওয়া

৭. উদ্দীপকের কোন গুচ্ছ হাম রোগের লক্ষণ?

ক. গুচ্ছ-A   খ. গুচ্ছ-B
গ. গুচ্ছ-A ও B   ঘ. গুচ্ছ-B ও C

৮. উদ্দীপকের রোগগুলো প্রতিরোধে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো-

i. যথাসময়ে প্রতিরোধমূলক টিকা গ্রহণ

ii. কীট পতঙ্গের কামড় এড়িয়ে চলা

iii. বিশুদ্ধ পানি পান ও ব্যবহার নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল

শিশু জন্মগ্রহণ করলে পরিবারে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সকলেই শিশুটিকে আদর করতে চায়। মায়ের সযত্ন পরিচর্যায় শিশুটি ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। শিশুটি কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে বড়ো হয়ে ওঠে। প্রথমে যে পর্যায়ে সে বেড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে শৈশবকাল। এর ব্যাপ্তি ধরা হয় পাঁচ বছর। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং দশের পর থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত বয়সকে কৈশোর বলে। শৈশব ও যৌবন এ দুইয়ের মাঝে কৈশোর একটি সেতুর মতো কাজ করে। কিশোর ও কিশোরীর জীবনের এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে।

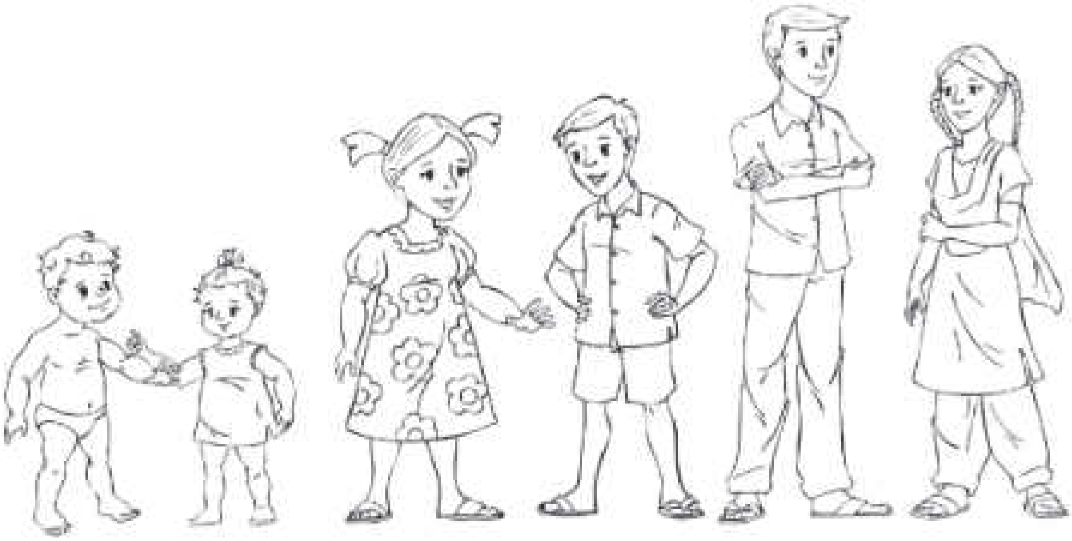

শিশু বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরী

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক, মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তনের সময় করণীয় নির্ধারণ করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপযোগিতা বর্ণনা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালের ঝুঁকি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে নিরাপদ থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- ঋতুস্রাবকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যবিধিসমূহ মেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারব। [ছাত্রীদের জন্য]

পাঠ-১ : বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক, মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকাল প্রতিটি কিশোর ও কিশোরীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং যৌবনে এসব পরিবর্তন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ছেলেদের ১০ থেকে ১৫ বছর এবং মেয়েদের ৮ থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এ সময়ে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

ছেলেদের পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ

ক. দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠা, খ. দ্রুত ওজন বৃদ্ধি, গ. শরীরে দৃঢ়তা আসা, ঘ. শরীরের গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হয়ে ওঠা, ঙ. দাড়ি-গোঁফ গজাতে থাকা, চ. স্বরভঙ্গ হওয়া ও গলার স্বর মোটা হওয়া, ছ. বুক ও কাঁধ চওড়া হয়ে ওঠা।

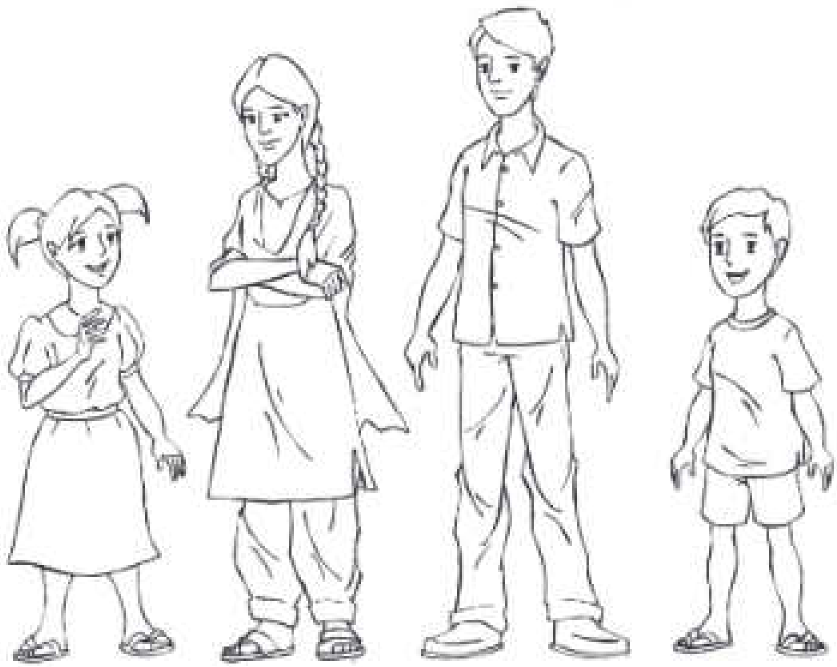

বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তন

মেয়েদের পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ

ক. মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, খ. শরীর ভারী হওয়া, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হওয়া ছাড়াও আরও কিছু শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। শারীরিক এসব পরিবর্তন সবার বেলায় একই সময়ে একই রকম নাও হতে পারে।

সৌন্দর্য-সচেতনতা বাড়ে

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন : বয়সন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি যেসব মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন হয় তা হচ্ছে–

মানসিক পরিবর্তন

ক. নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়।

খ. আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

গ. ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

ঘ. এসময় নানাধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করে।

আচরণিক পরিবর্তন

ক. প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে।

খ. নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

গ. বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে নিজেকে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

ঘ. দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের আগ্রহ বাড়ে।

পাঠ–২ : বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক, মানসিক ও আচরনিক পরিবর্তনের সময় করণীয়

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেসব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রতিটি ছেলেমেয়ের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল আসে। এ সময় শরীর ও মনের অনেক অজানা পরিবর্তনের সূচনা হয়। ছেলেমেয়েদের কাছে তাদের চারপাশের পরিবেশের পরিচিত রূপ বদলে যায়। অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করে, যার পরিণতি সব সময় ভালো নাও হতে পারে। এছাড়া সঠিক জ্ঞানের অভাবে কখনো কখনো তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

পড়াশোনা ও খেলাধুলা

ছেলেমেয়েদের এরূপ অবস্থায় বাবা, মা, শিক্ষক, বড়ো বোন বা ভাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন। যাতে ছেলেমেয়েরা সহজে ও মন খুলে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাবলি সম্পর্কে বাবা, মা ও স্কুলের শিক্ষক ছেলেমেয়েদের আগে থেকে স্পষ্ট ধারণা দেবেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে নিয়োজিত রাখতে হবে। এছাড়া ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে মেনে চলতে হবে।

কাজ–২ : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সম্পর্কে জানা থাকার সুবিধা এবং জানা না থাকার অসুবিধাগুলো লিখ।

পাঠ–৩ : বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের উপযোগিতা : শরীর রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে সঠিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেসব খাদ্য শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে সেসব খাদ্যকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। আর সুষম খাদ্য শরীরে পুষ্টি জোগায়। আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য ও পানি– এই ৬টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবারকে সুষম খাদ্য বলে। খাদ্যের ৬টি উপাদান শরীরের যেসব কাজ করে তা নিম্নরূপ :

১. **আমিষজাতীয়** খাদ্য দেহগঠন, দেহের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। এই খাদ্য দেহে কর্মশক্তি যোগায় ও রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির, ডাল, শিম ইত্যাদি।

২. **শর্করাজাতীয়** খাদ্য দেহের তাপ ও কর্মশক্তি যোগায়। এ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে চাল, গম, ভুট্টা, আলু, চিনি, মধু, কলা, আম, আনারস ইত্যাদি।

৩. **স্নেহজাতীয়** খাদ্য দেহের তাপ ও কর্মশক্তি জোগায়। এ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে মাখন, ঘি, চর্বি, সয়াবিন, সরিষার তেল, দুধ, মাছের তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদি।

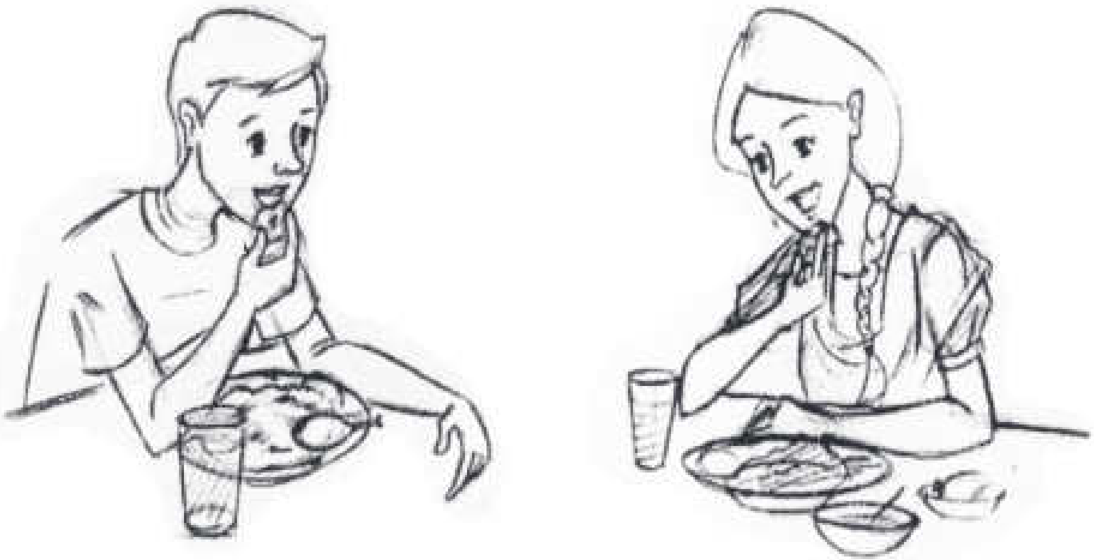

পরিমিত পুষ্টিমাণসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য খাওয়া

৪. **ভিটামিনসমৃদ্ধ** খাদ্য দেহের রোগ প্রতিরোধ করে এবং বিভিন্ন অঙ্গের কাজকে সচল রাখে। এ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাছের তেল, হলুদ ও লাল রংয়ের শাকসবজি, কচুশাক, বিভিন্ন ফল, যকৃত, সবরকমের ডাল ও তৈল বীজ, চাল, আটা ইত্যাদি।

৫. **খনিজসমৃদ্ধ** খাদ্য দেহের ক্ষয়রোধ ও অভ্যন্তরীণ গঠনের কাজ করে। এ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে আয়োডিনযুক্ত লবণ, দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, ছোট মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, ডাল, সবরকমের শাকসবজি, বিভিন্ন রকমের ফল, ডাবের পানি ইত্যাদি।

৬. পানি দেহের গঠনে ভূমিকা এবং দেহকে সচল রাখে। আমাদের দেহে প্রায় ৭০ ভাগ পানি রয়েছে। পানি খাদ্য-দ্রব্য হজমে, রক্ত চলাচলে, দেহকোষে পুষ্টি পরিবহনে সাহায্য করে। দেহের বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণে পানির প্রয়োজন হয়।

বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্যের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েরা দ্রুত বেড়ে ওঠে। এই বয়সে তারা পড়াশোনা, খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতি কিছু না কিছু নিয়ে সবসময়ই মেতে থাকে। এ কারণে তাদের বেশি ক্যালরি বা খাদ্যশক্তির প্রয়োজন হয়।

সুষম খাদ্য

বয়ঃসন্ধিকালে দ্রুত বর্ধনশীল শরীরের জন্য পুষ্টিমানসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য যথাযথ পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার। এ বয়সে ছেলেমেয়েদের প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য শরীরে শক্তি যোগায়, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। তবে পুষ্টিমান কম এমন খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের বৃদ্ধি যেমন ঠিকমতো ঘটবে না, তেমনি মানসিক বিকাশও ব্যাহত হবে। আবার যদি শারীরিক পরিশ্রম না করা হয় এবং শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া হয় তাহলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে। শরীর হালকা-পাতলা রাখার জন্য যদি কম খাবার গ্রহণ করা হয় তাহলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই বয়ঃসন্ধিকালের সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস যেমন গড়ে তোলা উচিত, তেমনি সঠিক পরিমাণ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কাজ–১ : বামপাশের কলামে খাদ্যের নাম ও ডানপাশের কলামে এলোমেলোভাবে সাজানো উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটির সাথে তীর চিহ্ন এঁকে মেলাও।

খাদ্য	প্রধানত দেহের যে কাজে লাগে
১. চাল	- রোগ প্রতিরোধ করে।

২. রঙিন শাক-সবজি	- দেহের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করে।
৩. সব রকমের ফল	- রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।
৪. আয়োডিনযুক্ত লবণ	- দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করে।
৫. কচু শাক	- রক্ত চলাচলে সাহায্য করে।
৬. মাংস ও ডিম	- রোগ প্রতিরোধ করে।
৭. পানি	- দেহের ক্ষয়পূরণ করে।
৮. মাখন	- দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করে।
৯. সব রকমের	- তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

কাজ–৩ : তোমাদের এলাকায় যেসব খাদ্য স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় সেসব খাদ্যের নাম দিয়ে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করো। (সুষম খাদ্য তালিকায় সকাল, দুপুর, বিকেল ও রাতে খাওয়া হবে এমন খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধু কোন জাতীয় খাদ্য?

ক. আমিষ খ. শর্করা

গ. স্নেহ ঘ. ভিটামিন

২. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের কী পরিবর্তন হয়?

ক. শারীরিক ও আর্থিক খ. শারীরিক ও মানসিক

গ. আর্থিক ও সামাজিক ঘ. সামাজিক ও মানসিক

৩. আমিষ জাতীয় খাদ্যের কাজ হলো-

i. শরীরের ক্ষয়পূরণ

ii. দেহের কর্ম শক্তি যোগান

iii. শরীরের বৃদ্ধি সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের পরিবর্তনগুলো হলো-

i. শরীরের গঠন প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো

ii. স্বর ভঙ্গ হওয়া

iii. শরীরের হাড় মোটা হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. বয়ঃসন্ধিকালের পূর্ণতা আসে কখন?

ক. বাল্যকালে খ. যৌবনকালে

গ. শৈশবকালে ঘ. বৃদ্ধকালে

৬. কোনটি বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন?

ক. আবেগ খ. স্বরভঙ্গ হওয়া

গ. শরীর ভারী হওয়া ঘ. হাড় মোটা ও দৃঢ় হওয়া

৭. বয়ঃসন্ধিকালের আচরণিক পরিবর্তন কোনটি?

ক. প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করা খ. আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে

গ. ছেলেমেয়ের পরস্পরের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হয় ঘ. নানা ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করে

নিচের উদ্দীপকটি দেখে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চিত্রঃ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রিফার খাদ্য তালিকার কয়েকটি উপাদান

৮. উদ্দীপকে রিফার সুষম খাদ্য তালিকায় কোনটি অনুপস্থিত রয়েছে?

ক. আমিষ খ. স্নেহ

গ. শর্করা ঘ. খনিজ

৯. তালিকায় খাদ্যটির অনুপস্থিতির অভাবে রিফার-

i. দেহ গঠন, বৃদ্ধিসাধন দেরিতে ঘটবে

ii. শরীরের তাপ ও কর্মশক্তি হ্রাস পাবে

iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনের জন্য খেলাধুলা

খেলাধুলা শিশুদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। যে শিশুটি কয়েক দিন আগে জন্মগ্রহণ করেছে, পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই যার ভালো পরিচয় গড়ে ওঠেনি, সেই শিশুও নিজের মনে খেলে। ধীরে ধীরে এই শিশু বড়ো হয়ে চলতে-ফিরতে, ছুটতে শেখে এবং এভাবেই একসময় পৌঁছে যায় খেলার মাঠে। শিশু বা বয়স্ক হোক, সব মানুষের কাছেই খেলাধুলার একটা অনিবার্য আকর্ষণ আছে। কারণ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে পারি। নিয়মিত খেলাধুলাই পারে আমাদের শরীর ও মনকে সুস্থ, সবল ও সতেজ রাখতে।

ফুটবল ক্রিকেট অ্যাথলেটিকস্

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শারীরিক সুস্থতায় খেলাধুলার প্রভাব বর্ণনা করতে পারব।
- ইনডোর ও আউটডোর গেমসের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হব।
- ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা এবং অ্যাথলেটিকস্-এর নিয়মকানুন জানব এবং অনুশীলন করব।
- আগ্রহ অনুযায়ী কমপক্ষে একটি খেলায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করে খেলাধুলায় পারদর্শী হব।

পাঠ–১ : খেলাধুলার গুরুত্ব– খেলাধুলা শিশুর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুযোগ পেলেই তারা খেলাধুলায় মেতে ওঠে এবং অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে। খেলাধুলার প্রতি শিশুর এ স্বাভাবিক প্রবণতা ও অফুরন্ত আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। খেলাধুলা ছাড়া শিশুর দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। তাই শিশুর পরিপুর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে খেলাধুলাকে আমাদের অগ্রাধিকারের বিবেচনায় রাখতে হবে। স্বাভাবিক নিয়মে কোনো কিছুর প্রতি মানুষের মনোযোগ দীর্ঘক্ষণ থাকে না। একটানা অনেকক্ষণ শ্রেনিকক্ষের পড়াশোনা মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। এতে তাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়। এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে খেলাধুলা। এতে পাঠের একঘেয়েমি দুর হবে এবং মনের সজীবতা ফিরে আসবে। পরবর্তী কোনো কাজ আগ্রহ নিয়ে নতুন উদ্যমে করতে পারবে। সর্বোপরি খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করে ছেলেমেয়েদের সামাজিক মনোভাবের উন্নতি হয়। গৃহের সীমাবদ্ধ পরিবেশের বাইরে এসে তারা নিজেকে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। খেলাধুলার নানাবিধ আইন-কানুন অনুসরণ করে, শৃঙ্খলা রক্ষা করে সময়মতো চলতে অভ্যস্ত হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

কাজ–১ : তোমাদের এলাকার সমবয়সীদেরকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তোমরা কী কী কাজ করতে পার? বর্ণনা কর।

কাজ–২ : খেলাধুলার মাধ্যমে কী কী গুণ অর্জিত হয়? বোর্ডে লিখে একজন ব্যাখ্যা কর।

পাঠ–২ : ইনডোর গেমস– খেলা হচ্ছে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিষয়। বড়ো খেলার মাঠ বা আঙিনা না থাকলে খেলাধুলা করা যাবে না– এ ধারণা ঠিক নয়। ঘরের ভেতর বসেও বিভিন্ন রকম খেলাধুলা করা যায়। সাধারণত ঘরে বসেই যেসব খেলা হয় তাকেই ঘরোয়া খেলা বা ইনডোর গেমস বলে। যেমন– দাবা, ক্যারম, লুডু ইত্যাদি।

দাবা : দাবা খেলার জন্ম কোন দেশে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলে ভারতে, কেউ বলে পারস্যে আবার কেউ বলে চীন দেশে। তবে বেশির ভাগই বলে, দাবা খেলার কোর্ট বা ছক আবিষ্কার করেন হানসিং নামক একজন চীনা লোক। দাবা বর্তমান যুগে চমকপ্রদ এক বুদ্ধির খেলা।

দাবা বোর্ড : দাবা বোর্ড ৬৪টি সম-আকৃতি বর্গক্ষেত্র নিয়ে গঠিত। বোর্ডের ক্ষেত্রগুলো সাদা ও কালো রং দিয়ে একের পর এক ধারাক্রমে সজ্জিত। বোর্ডের সাদা ঘর খেলোয়াড়দের ডান দিকে থাকবে। খেলা আরম্ভের সময় একজন খেলোয়াড়ের ১৬টি সাদা এবং অপরজনের ১৬টি কালো রঙের ঘুঁটি থাকে। ঘুঁটিগুলোর মধ্যে ১টি রাজা, ১টি মন্ত্রী, ২টি নৌকা, ২টি হাতি, ২টি ঘোড়া, ৮টি বোড়ে বা পণ থাকে।

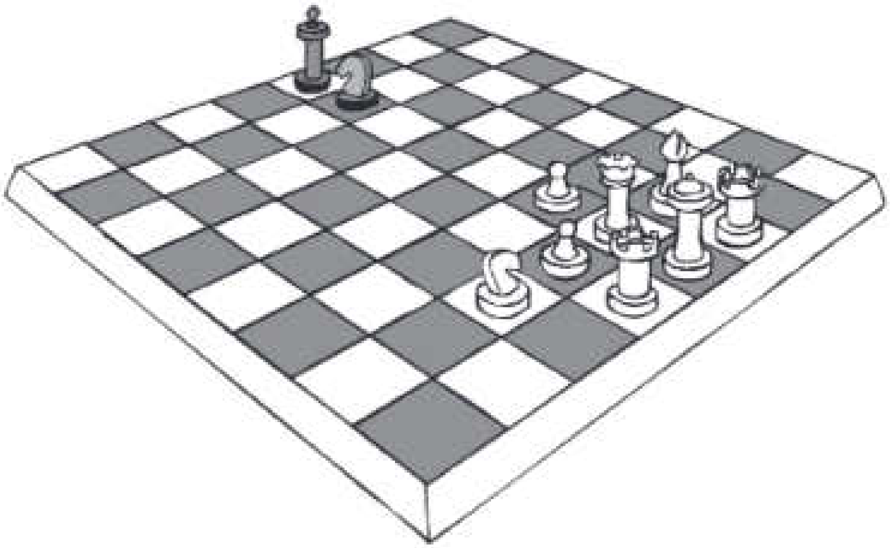

দাবা বোর্ড

দাবার চাল : এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুঁটির স্থান পরিবর্তনকে দাবার চাল বলে। প্রথমে কে চাল দেবে তা টস্ করে ঠিক করতে হয়। যে সাদা ঘুঁটি নেবে সে প্রথমে চাল দেবে। দাবার ঘুঁটির চালগুলো বিভিন্ন ধরনের। এবার ওদের চালাচালি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

রাজা : রাজা তার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে অর্থাৎ সবদিকে এক ঘর যেতে পারে।

মন্ত্রী : বোর্ডের ওপর মন্ত্রীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। বোর্ডের একটি নৌকা ও গজ বা হাতির শক্তির সমান। মন্ত্রী নৌকার মতো ডানে-বামে এবং গজের মতো কোনাকুনি চলতে পারে। সামনে ঘুঁটি খেয়ে ঘর দখল করতে পারে। মন্ত্রীর মান নয় (৯)।

নৌকা : ডানে-বামে অথবা সামনে-পেছনে নৌকা সোজা পথে চলে। কোনো ঘুঁটি ডিঙিয়ে যেতে পারে না। তবে চলার পথে কোনো ঘুঁটি থাকলে তা খেয়ে ওই ঘর দখল করতে পারে। নৌকার মান ছয় (৬)।

গজ বা হাতি : গজ কোনাকুনি চলে। কালো ঘরের গজ কালো ঘর দিয়ে, সাদা ঘরের গজ সাদা ঘর দিয়ে চলতে পারে। গজের মান তিন (৩)।

ঘোড়া : ঘোড়া সামনে পেছনে, ডানে-বামে এক্কেবারে আড়াই ঘর লাফাতে পারে। নিজ বা বিপক্ষের ঘুঁটির ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে যেতে পারে। ঘোড়ার মান তিন (৩)।

বোড়ে বা সৈনিক : বোড়ে হলো রাজার সৈনিক। এটি প্রথম চালে ইচ্ছা করলে দুই ঘর যেতে পারে। পরবর্তী চালগুলো এক ঘর করে এগিয়ে যাবে। অন্যসব ঘুঁটি পেছনে সরিয়ে আনা যায় কিন্তু বোড়ে কখনোই পেছনে চালা যায় না। বোড়ের মান এক (১)। বোড়ে কোনাকুনি একঘর সামনের ঘুঁটি খেতে পারে।

ক্যাসলিং : কিস্তি বাঁচানোর জন্য রাজা ও নৌকার মধ্যে জায়গা বদলের যে চাল দেওয়া হয় তাকে ক্যাসলিং বলে।

খেলার নিয়ম : প্রথমে সাদা বোড়ে ১ ঘর বা ২ ঘর চালতে পারে। বোড়ে বাদে ঘোড়াও চালা যায়। তারপর বিপক্ষের চালের অবস্থা বুঝে চাল দিতে হয়। যদি কোনো বোড়ে শেষ প্রান্তে বা ৮ নং ঘরে পৌঁছায় তাহলে উক্ত বোড়ের পদোন্নতি হয়ে মন্ত্রী, নৌকা, হাতি, ঘোড়া যেকোনো ঘুঁটি হবে। রাজাকে কখনো চালমাত করা যায় না। চালমাত অর্থ হলো রাজা বিপক্ষের ঘুঁটির শক্তির কিস্তির মুখে নেই অথচ চালও দিতে পারছে না। এভাবে খেলতে খেলতে যার রাজা আটকে যাবে সে পরাজিত হবে।

কাজ–১ : ইনডোর গেমস কাকে বলে? ইনডোর গেমসে কি কি খেলা হয় তা লিখ।

কাজ–২ : দাবা খেলতে কী কী সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়? এর তালিকা তৈরি কর।

ক্যারম : ক্যারম খেলা অভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ঘরে বসে সহজে আনন্দ লাভের জন্য ক্যারমের জুড়ি মেলা ভার। একক ও দ্বৈত দুভাবেই ক্যারম খেলা যায়।

ক্যারম বোর্ড : বোর্ডটি বর্গাকার হয়ে থাকে। বোর্ডের উপরিভাগ হয় সমতল ও খুবই মসৃণ। বোর্ডের চার কোনায় চারটি গোলাকার পকেট থাকে। বোর্ডের মাঝখানে একটি বৃত্ত থাকে, এর ভিতর ঘুঁটি বসাতে হয়।

ঘুঁটি : ক্যারম খেলার ঘুঁটি ৯টি সাদা, ৯টি কালো এবং ১টি লাল রঙের। প্রত্যেকটি ঘুঁটি আকারে ও ওজনে একই রকম হবে।

স্ট্রাইকার : ক্যারম খেলার ঘুঁটিগুলোকে আঘাত করে পকেটে ফেলার জন্য ওজনে ও আকারে বড়ো একটি বৃত্তাকার ঘুঁটি ব্যবহার করা হয় যাকে স্ট্রাইকার বলে।

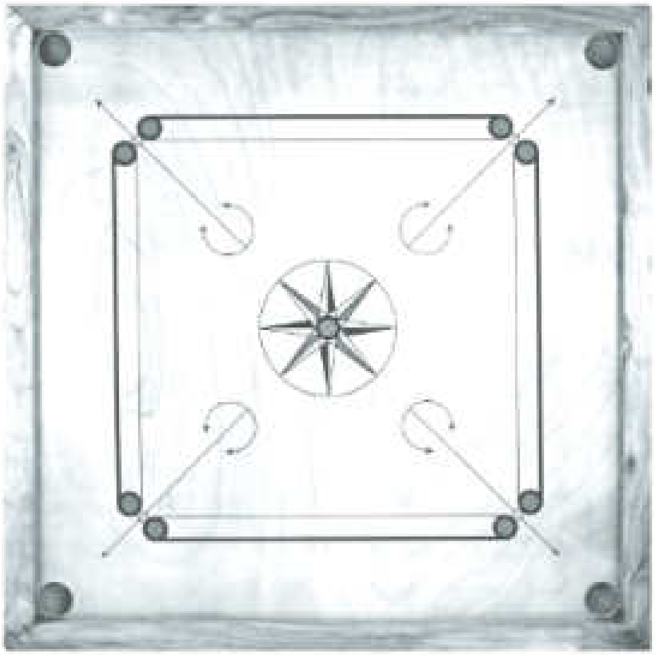

ক্যারম খেলার জন্য উন্নতমানের বোরিক পাউডার ব্যবহার করতে হবে যাতে বোর্ডের উপরিভাগ মসৃণ ও শুকনো থাকে।

স্ট্রাইক করার নিয়ম

ক. স্ট্রাইকারে আঙুল দিয়ে আঘাত করতে হবে, ধাক্কা দেওয়া যাবে না।

খ. যে হাত দিয়ে খেলবে সেই হাতের কনুই বোর্ডের উপরিভাগে আসতে পারবে না।

ব্রেক : বোর্ডে প্রথম আঘাতের আগে সেন্টার সার্কেলে রেড বসিয়ে তার চারদিকে পর্যায়ক্রমে সাদা ও কালো ঘুঁটি বসাতে হবে। প্রথম স্ট্রাইক করার জন্য যে খেলোয়াড়কে (টসের মাধ্যমে) নির্ধারণ করা হয়েছে সেই ব্রেক নেবে। ব্রেক গ্রহণকারী খেলোয়াড় সাদা ঘুঁটি এবং বিপক্ষ কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলবে। এভাবে পালাক্রমে ব্রেক গ্রহণ চলতে থাকবে। রেড থাকবে উভয় দলের জন্য সাধারণ।

স্কোরিং পদ্ধতি

ক. ২৫ পয়েন্টে এক গেম হবে। যে খেলোয়াড় সর্বপ্রথম ২৫ পয়েন্ট অর্জন করবে সে বা সেইপক্ষ জয়লাভ করবে।

খ. ঘুঁটি এবং রেড-এর মান বা পয়েন্ট হচ্ছে যথাক্রমে ১ ও ৩।

গ. কোনো খেলোয়াড় কোন বোর্ডে জয়লাভ করলে ওই বোর্ডে বিপক্ষের যত ঘুঁটি থাকবে সে তত সংখ্যক পয়েন্ট অর্জন করবে। কভারিংসহ যদি সে রেড পকেটে ফেলতে পারে তাহলে অতিরিক্ত ৫ পয়েন্ট লাভ করবে। ২৪ পয়েন্ট অর্জনের পর রেডের পয়েন্ট যোগ হবে না।

ঘ. রেড পকেটে ফেলার পর কভারিংয়ের এর জন্য তাকে আর একটি স্বীয় রঙের ঘুঁটি পকেটে ফেলতে হবে।

ঙ. তিন গেমের মধ্যে যে পক্ষ সর্বাধিক অর্থাৎ দুই গেমে জয়লাভ করবে সে বিজয়ী ঘোষিত হবে।

> **কাজ-১** : ক্যারম খেলার নিয়মাবলি বোর্ডে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৩ : আউটডোর গেমস- ঘরের বাইরে অর্থাৎ খেলার মাঠ বা বৃহৎ পরিসরের খোলা জায়গায় যেসব খেলাধুলা হয় তাকে আউটডোর গেমস বলে। যেমন- ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, গোল্লাছুট, দাড়িবান্ধা, এক্কাদোক্কা, কানামাছি, বউচি, ইদুর বিড়াল, অ্যাথলেটিকস্ ইত্যাদি।

ফুটবল : ফুটবল একটি আন্তর্জাতিক খেলা। বাংলাদেশেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম নয়। ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে শারীরিক কর্মদক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, দলীয় একাত্মবোধ, পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্বদান প্রভৃতি গুণ অর্জিত হয়।

নিয়মাবলি

১. খেলার মাঠ

ফুটবল খেলার মাঠ আন্তর্জাতিকভাবে দৈর্ঘ্যে ১১০ গজ এবং প্রস্থে ৭০ গজ হয়ে থাকে। তবে জুনিয়রদের জন্য দৈর্ঘ্যে ৮০ গজ ও প্রস্থে ৫০ গজ মাপের মাঠে ফুটবল খেলা যেতে পারে। গোলপোস্ট উচ্চতায় ৮ ফুট এবং এক পোস্ট থেকে অন্য পোস্টের দূরত্ব ২৪ ফুট। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ৬ গজ এবং মাঠের দিকে ৬ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয় তাকে গোল এরিয়া বলে। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ১৮ গজ ও মাঠের দিকে ১৮ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয় তাকে পেনাল্টি এরিয়া বলে। দুই গোলপোস্টের ঠিক

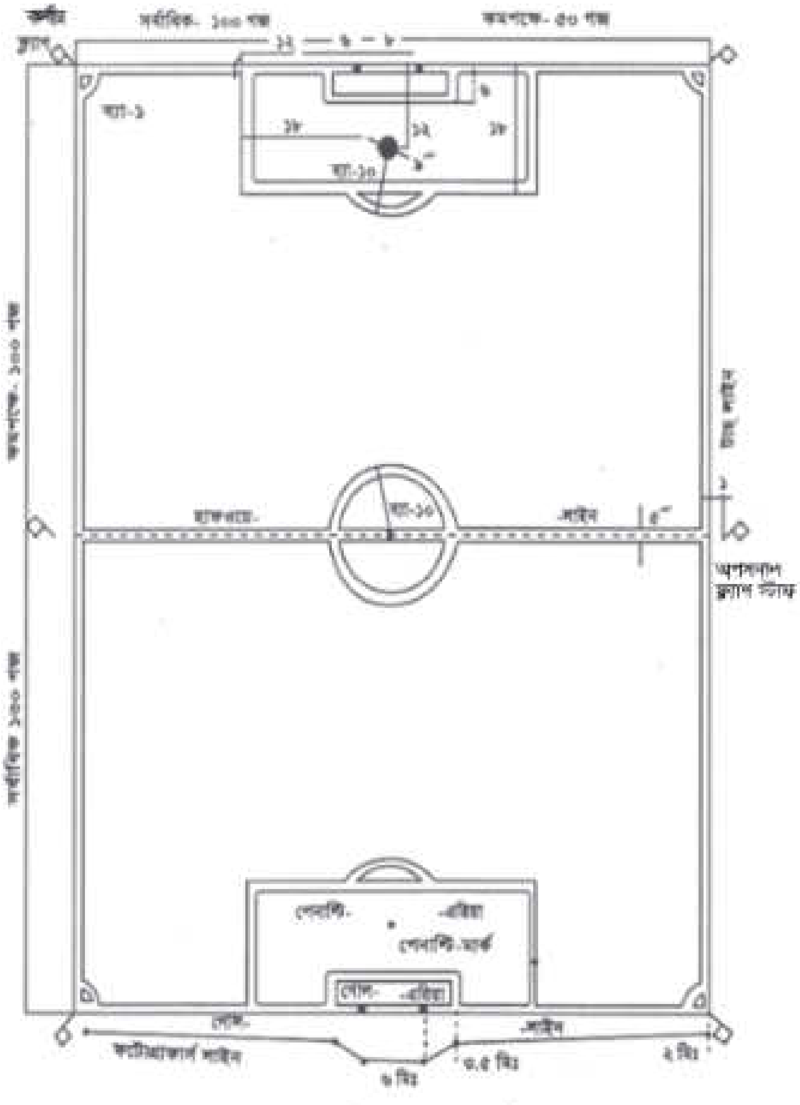

ফুটবল খেলার মাঠ

মাঝখান থেকে মাঠের ভিতর ১২ গজ সামনে একটি পেনাল্টি স্পট থাকে। যেখান থেকে পেনাল্টি কিক মারা হয়। মধ্যমাঠে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত করা হয়, যেখান থেকে কিক অফ করে খেলা শুরু করা হয়। এছাড়া মাঠের কোনায় ১ গজের একটি কোয়ার্টার সার্কেল থাকে যেখান থেকে কর্নার কিক করা হয়।

২. খেলোয়াড় সংখ্যা : দুই দলে ১১জন করে মোট ২২জন খেলোয়াড় খেলে।

৩. রেফারি : খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি, দুজন সহকারী রেফারি ও একজন চতুর্থ রেফারি থাকেন।

৪. খেলার স্থিতিকাল : খেলার নির্ধারিত সময় ৯০ মিনিট। তবে ছোটোদের জন্য ৩৫+১০+৩৫ মিনিট খেলা হতে পারে।

৫. খেলা আরম্ভ : খেলার শুরুতে টসে জয়ী দলকে অবশ্যই মাঠের যে কোনো সাইড বেছে নিতে হবে। টসে পরাজিত দল রেফারির সংকেতের সাথে সাথে 'কিক অফ'-এর মাধ্যমে খেলা শুরু করবে।

কাজ-১ : একটি ফুটবল খেলার মাঠ অঙ্কন কর।

কাজ-২ : ফুটবল খেলার নিয়মাবলি খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

পাঠ-৪ : নিয়মাবলি- ফাউল ও অসদাচরণ- অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য দুই ধরনের ফ্রি কিক দেওয়া হয়। যথা- ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট। যে কিকে সরাসরি গোল করা যায় তাকে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক বলে। যে কিকে সরাসরি গোল করা যায় না তাকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক বলে। নিম্নলিখিত ১০টি অপরাধের জন্য ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়-

১) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।

২) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা বা ল্যাং মারার চেষ্টা করা।

৩) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের ওপর লাফিয়ে পড়া।

৪) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ বা চার্জ করা।

৫) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।

৬) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেওয়া।

৭) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আটকানো বা ধরে রাখা।

৮) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে বেআইনিভাবে ট্যাকল করা।

৯) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের গায়ে থুতু দেওয়া।

১০) ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা (তবে নিজ পেনাল্টি এরিয়ায় গোলরক্ষকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়)।

নিম্নলিখিত কারণে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়

১) গোলরক্ষক তার হাতে বল নিয়ন্ত্রণের পর খেলার মাঠে পাঠানোর আগে যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে।

২) গোলরক্ষক একবার বল ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য কোনো খেলোয়াড়ের ছোঁয়ার আগেই যদি পুনরায় বলটি ধরে।

৩) নিজ দলের কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত কিক করা বল বা ব্যাকপাস যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে ছোঁয় বা ধরে;

৪) নিজ দলের কোনো খেলোয়াড়ের কর্তৃক থ্রো-ইন করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে ছোঁয় বা ধরে;

৫) বিপজ্জনকভাবে খেলা।

৬) বল না খেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সম্মুখগতিতে বাধা দেওয়া।

৭) গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেওয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া।

থ্রো-ইন : বল মাঠের পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো-ইনের মাধ্যমে পুনরায় খেলা শুরু করতে হয়। থ্রো-ইন করার সময় বল দুই হাতে সমান ভর দিয়ে মাথার পেছন দিক থেকে এবং মাথার উপর দিয়ে দুই পা মাঠের বাইরে বা দাগের উপর রেখে বল মাঠের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হয়। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

গোল কিক : বিপক্ষের খেলোয়াড়ের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে তাহলে গোল কিক হয়। গোল কিক গোল এরিয়ার মধ্য থেকে বল বসিয়ে মারতে হয়। গোল কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। তবে গোল কিক পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে না গেলে বল খেলার মধ্যে গণ্য হয় না।

কর্নার কিক : ডিফেন্ডারদের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে তাহলে বিপক্ষ দল একটি কর্নার কিক পায়। গোললাইনের যে পাশ দিয়ে বল গোললাইন অতিক্রম করে, সেই পাশের কোনা থেকে কর্নার কিক মারতে হয়।

কাজ-১ : জোড় সংখ্যার রোল নম্বরধারী শিক্ষার্থীরা ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়ার নিয়ম লিখ। এবং বিজোড় রোল নম্বরধারী শিক্ষার্থীরা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়ার নিয়ম লিখ।

পাঠ-৫ : ফুটবলের কলাকৌশল– ফুটবল মূলত পা দিয়ে খেলা হয়। তাই পায়ের সাহায্যে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার ওপরই ফুটবল খেলার দক্ষতা নির্ভর করে। কাজেই পা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। পায়ের পাতার তিনটি দিক আছে।

১) পায়ের ভেতরের দিক (ইনসাইড)

২) পায়ের বাইরের দিক (আউটসাইড)

৩) পায়ের পাতার ওপরের দিক (ইনস্টেপ)

এছাড়া পায়ের আঙুলের দিককে টৌ এবং পায়ের পেছনের দিককে হিল (গোড়ালি) বলে।

পায়ের পাতার বিভিন্ন অংশ

ক) কিকিং : পায়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে নানা রকম কিক মারা যায়। ইনসাইড কিক সহজ এবং খুব সহজে আয়ত্ত করা যায়। ইনসাইড কিক মারার সময় নন-কিকিং ফুট ফুটবলের লাইনের সামান্য পেছনে এবং বল থেকে ৬-৮ ইঞ্চি দূরে স্থাপন করে বলের ওপর দৃষ্টি রেখে পায়ের বাঁকানো অংশ দিয়ে কিক মারতে হয়। যে পা দিয়ে কিক মারবে তার বিপরীত পায়ের ওপর দেহের ভর রেখে দুই হাত সামান্য প্রসারিত করে কিক করবে। কিক করার পর কিকিং ফুট ফুটবলের দিকে এগিয়ে যাবে। এছাড়া নিচু সোজা কিক শুধু পায়ের উপরের অংশে ব্যবহার করে বলের মাঝখানে কিক মারতে হয় এই কিককে লো হার্ড কিক বলে।

কিকিং

খ) হেডিং : মাথা দিয়ে বল খেলাকে হেডিং বলে। হেড করার সময় বল এর দিকে দৃষ্টি রেখে দেহকে সামান্য পেছনে এনে ঘাড় শক্ত করে মাথার সামনের অংশ (কপাল) দিয়ে হেড করতে হয়। হেড করে বলকে সামনে, পেছনে ও পাশে পাঠানো যায়।

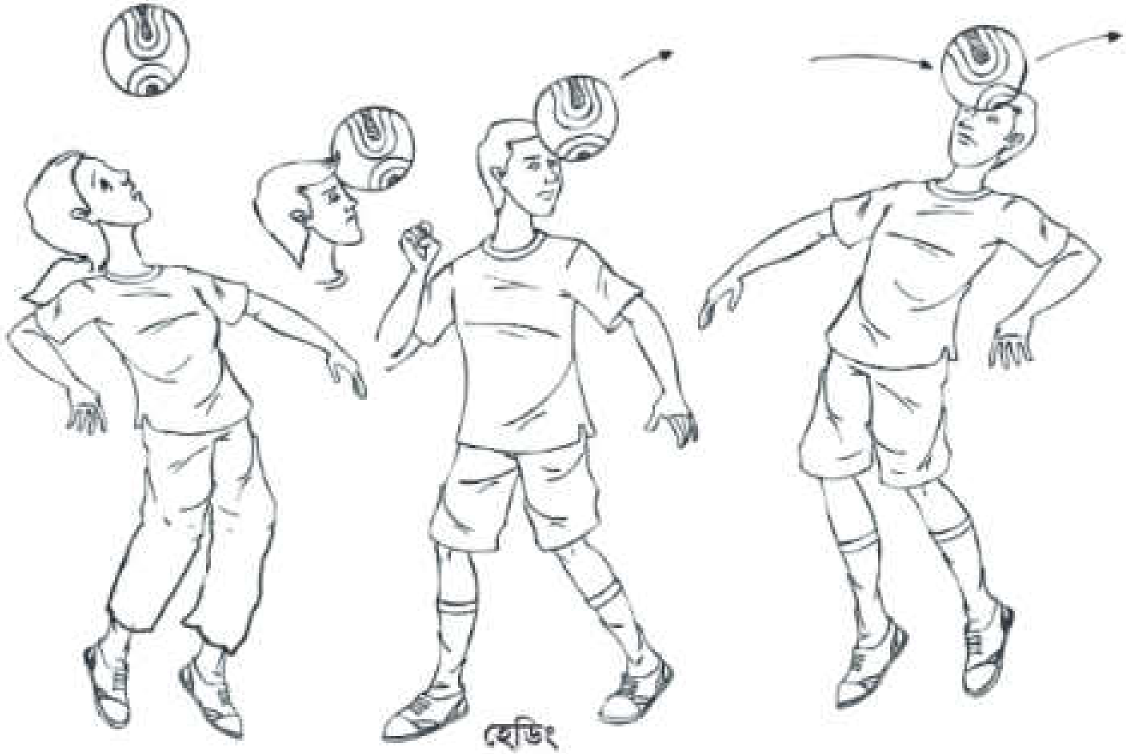

হেডিং

পাঠ–৬ : ক্রিকেট– ক্রিকেট একটি আন্তর্জাতিক খেলা। এ খেলার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে। বর্তমানে বাংলাদেশেও খেলাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। শহর ছাড়া গ্রামে-গঞ্জেও এখন ক্রিকেট খেলা হয়ে থাকে।

খেলার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলি

১) **খেলোয়াড়–** দেশে ১৪জন এবং বিদেশে ১৫জন খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হয়। খেলতে নামে ১১জন। টসের মাধ্যমে বোলিং বা ব্যাটিং কোন দল করবে তা নির্ধারিত হয়।

২) **পিচ–** ক্রিকেট খেলার পিচ দৈর্ঘ্যে ২২গজ এবং প্রস্থে ১০ফুট হয়ে থাকে।

৩) **আম্পায়ার–** দুজন আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করেন এবং একজন স্কোরার থাকেন।

৪) **উইকেট–** পিচের দুই প্রান্তে তিনটি করে স্টাম্প দিয়ে দুটি উইকেট তৈরি করা হয়। উইকেটের চওড়া ৯ ইঞ্চি। উইকেটের উপর দুটি বেল থাকে। বেলসহ মাটি থেকে উইকেটের উচ্চতা ২ ফুট ৪.৫ ইঞ্চি।

৫) **বোলিং ও পপিং ক্রিজ–** উইকেটের সাথে একই রেখায় বোলিং ক্রিজের দৈর্ঘ্য হবে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বোলিং ক্রিজের সামনে সমান্তরালভাবে ৪ ফুট যে দাগ কাটা হয় সেটিই পপিং ক্রিজ।

২০২৫

৬) **ম্যাচ :** ক্রিকেট খেলায় সাধারণত তিন ধরনের ম্যাচ হয়ে থাকে।

ক) টেস্ট ম্যাচ খ) ওয়ান ডে ম্যাচ গ) টি টোয়েন্টি ম্যাচ

ক. টেস্ট ম্যাচ : টেস্ট ম্যাচ দুই ইনিংসে খেলা হয়ে থাকে। প্রতিদিনই পর্যায়ক্রমে ব্যাটিং ও বোলিং করতে হয়। তবে সর্বোচ্চ ৯০ ওভার পর্যন্ত একদিনে খেলতে হয়।

খ. ওয়ান ডে ম্যাচ : এ ম্যাচে সর্বোচ্চ ৫০-৫০ অর্থাৎ ১০০ ওভার খেলা হয়। প্রত্যেক দল একবার ব্যাট ও বল করে।

গ. টি-টোয়েন্টি ম্যাচ : এই ম্যাচে প্রত্যেক দল ২০ ওভার করে ব্যাট ও বল করে।

৭) **ওভার :** ৬টি শুদ্ধ বলে একটি ওভার হয়। একজন বোলার ৬টি বল করে। ওভার শেষ হলে অন্য বোলার উইকেটের প্রান্ত বদল করে বল করবে।

ফিল্ডিংয়ের বিভিন্ন অবস্থান ও নাম

৮) **বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি :** ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে আসা বল মাঠের সীমানা পার হলেই চার রান হয়, এটাকে বাউন্ডারি বলে। বল শূন্যে দিয়ে সরাসরি সীমানার বাইরে পড়লে ছয় রান হয়, এটাকে ওভার বাউন্ডারি বলে।

৯) **নো বল :** বোলার বলটি ছুড়ে মারলে, সামনের পা সম্পূর্ণরূপে পপিং ক্রিজের রেখা অতিক্রম করলে, পেছনের পা রিটার্ন ক্রিজের মধ্যে না থাকলে নো বল হয়।

১০) **ওয়াইড বল :** আম্পায়ারের মতে বল যদি ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে দিয়ে যায় তাহলে ওয়াইড বল হয়।

১১) **ব্যাটসম্যান আউট :** বিভিন্ন কারণে ক্রিকেট খেলায় একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়।

ক) বোল্ড আউট- বোলিং করা বল উইকেটে লেগে বেল পড়ে গেলে বোল্ড আউট হয়।

খ) টাইমড আউট- নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে প্রবেশকালে তিন মিনিটের বেশি সময় নিলে টাইমড আউট হয়।

গ) হিট উইকেট- বল খেলতে গিয়ে যদি ব্যাট বা শরীরের কোনো অংশের স্পর্শ লেগে উইকেট ভেঙে যায়।

ঘ) রান আউট- রান নেওয়ার সময় পপিং ক্রিজে পৌঁছার আগেই ফিল্ডার কর্তৃক ছুড়ে দেওয়া বল উইকেটে লাগলে রান আউট হয়।

ঙ) ক্যাচ আউট- ব্যাট দিয়ে মারা বল মাটি স্পর্শ করার আগেই ফিল্ডার ধরে ফেললে ক্যাচ আউট হয়।

চ) স্টাম্পড আউট- খেলার সময় ব্যাটসম্যান যদি পপিং ক্রিজের বাইরে চলে যায় তখন উইকেটরক্ষক বল ধরে বেল ফেলে দিলে স্টাম্পড আউট হয়।

ছ) এল.বি.ডব্লিউ- যে বল উইকেটে লাগার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সেই বলকে ব্যাটসম্যান পা দিয়ে আটকালে এল.বি.ডব্লিউ (লেগ বিফোর উইকেট) আউট হয়।

কাজ–১ : কী কী কারণে ব্যাটসম্যান আউট হয় তা বর্ণনা কর।

কাজ–২ : ক্রিকেট খেলার নিয়মাবলি সম্পর্কে প্রত্যেকে একটি করে নিয়ম বোর্ডে গিয়ে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৭ : ক্রিকেটের কলাকৌশল–

১. ব্যাটিং– ব্যাটিং করতে হলে যে পাঁচটি জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেগুলো হলো–

ক. সবসময় বলের দিকে দৃষ্টি রাখা।

খ. বলের লাইন, দূরত্ব ও গতি অনুমান করার ক্ষমতা অর্থাৎ বল কোথায় যাচ্ছে ও কখন নির্দিষ্ট জায়গায় আসবে।

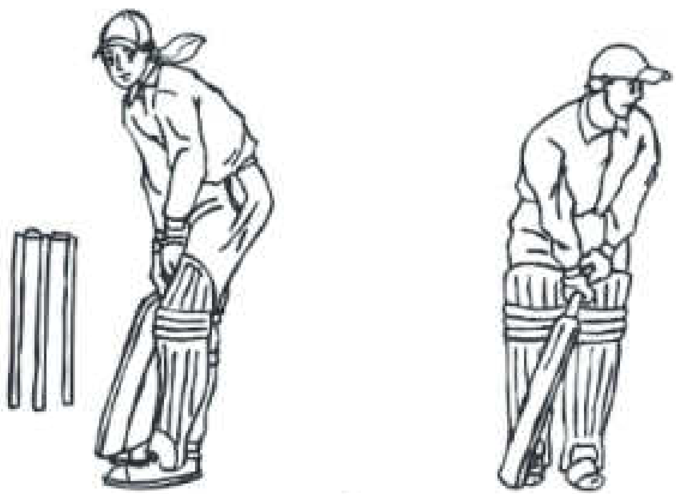

ব্যাটিং

গ. অবস্থা-বিশেষে উপযুক্ত ব্যাটিং স্ট্রোক নির্বাচন করা।

ঘ. সঠিক সময়ে সঠিক স্ট্রোক মারা।

ঙ. ঠিকমতো উপযুক্ত জায়গায় ব্যাট ও বলে সংযোগ ঘটানোর ক্ষমতা।

২. বোলিং– ক্রিকেট খেলায় বোলিং হলো আক্রমণাত্মক খেলার অংশ। বোলিং করে ব্যাটসম্যানকে আউট করার চেষ্টা করা হয়। সঠিকভাবে বল করতে হলে বল ধরা, বল নিয়ে দৌড়ে আসা, বল হাত থেকে ছোড়া (হাত ঘুরিয়ে), বল ছোড়ার পদক্ষেপ, বল এর দিকে অনুসরণ ইত্যাদি আয়ত্ত করতে হবে।

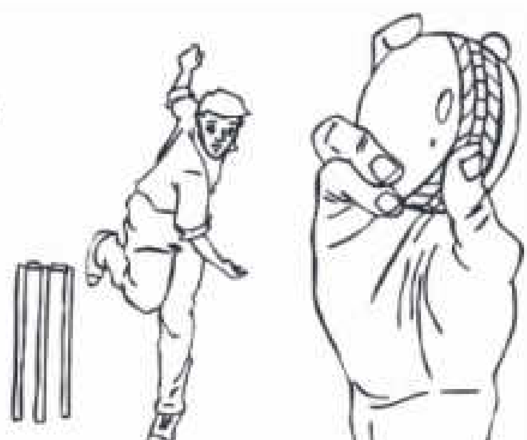

বোলিং

৩. ফিল্ডিং– যেকোনো দল ফিল্ডিং ভালো করতে পারলে খেলায় জেতার সম্ভাবনা থাকে। ফিল্ডিং বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে করা হয়। ফিল্ডিং সাধারণত দুইভাবে করা যেতে পারে। আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক।

৪. উইকেট কিপিং– উইকেটরক্ষককে উইকেটের পেছনে দুই পায়ের ওপর দেহের সমান ভার রেখে বোলিং করার সময় অর্ধ বসার ভঙ্গিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। দৃষ্টি উইকেট ও বলের ওপর রেখে দ্রুততার সাথে বল ধরতে হবে।

ফিল্ডিং

কাজ–১ :	ব্যাটিং করার সময় যে ৫টি বিষয় মনে রাখতে হয় তা লিখ।
কাজ–২ :	উইকেট রক্ষক উইকেটের পেছনে কোন ভঙ্গিতে প্রস্তুত থাকে তা করে দেখাও।

পাঠ–৮. গোল্লাছুট –গোল্লাছুট খেলায় দুটি দল থাকে। টসের মাধ্যমে গোল্লা বা ছুট দল নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিদলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা মাঠের মাপ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। একটি নির্দিষ্ট বাড়ি ও খেলা শুরুর স্থান থাকবে। এ দুটি স্থানের দূরত্ব মাঠের মাপ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। খেলা শুরু হওয়ার স্থানে গোল্লা বা ছুট দল অবস্থান করে তার দলের সবাইকে নিয়ে হাত ধরাধরি অবস্থায় থাকবে এবং সুযোগ বুঝে গোল্লাকে বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। এই পৌঁছানো দুইভাবে হতে পারে। এক- গোল্লা সরাসরি বাড়িতে যেতে পারবে। দুই- দলের পাকা খেলোয়াড় দূরত্ব কমানোর জন্য নূতন নূতন গোল্লা তৈরি করে দাঁড়াবে এবং বাড়ির দিকে গোল্লাকে নিয়ে আগাবে। বিপক্ষ দলের কাজ হচ্ছে পৌঁছাতে বাধা দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে স্পর্শ করে মারা। প্রতিদল ২০ মিনিট করে খেলবে। গোল্লা যতবার বাড়িতে পৌঁছাবে ততবার দুই পয়েন্ট পাবে। বিপক্ষ যদি গোল্লাকে স্পর্শ করতে পারে তখন বিপক্ষদল দুই পয়েন্ট পাবে। এইভাবে প্রতিদল ২০ মিনিট করে খেলার পর যে দলের পয়েন্ট বেশি হবে সেই দল বিজয়ী হবে।

পাঠ–৯ : অ্যাথলেটিকস– অ্যাথলেটিকসের সাহায্যে সুঠাম দেহ গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীরের সার্বিক উন্নতি করা সম্ভব। গতি, ক্ষিপ্রতা, শক্তি প্রভৃতি গুণ এর মাধ্যমে সহজে অর্জন করা যায়। অ্যাথলেটিকসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়–

১. ট্র্যাক ইভেন্ট– দৌড় সম্পর্কিত।

২. ফিল্ড ইভেন্ট– নিক্ষেপ ও লাফ সম্পর্কিত।

দৌড় সম্পর্কিত খেলাগুলোর সাহায্যে ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নিক্ষেপ ও লাফ ইভেন্টসগুলোর মধ্য দিয়ে শক্তি, সাহস, নিরীক্ষণ শক্তি, দ্রুততা প্রভৃতি অর্জিত হয়।

সাবধানতা : প্রতিটি ক্রীড়ায় বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আগে অবশ্যই ভালোভাবে শরীর গরম বা প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন করতে হবে। দৌড় প্রতিযোগিতার শেষে কখনোই হঠাৎ থামতে নেই। ধীরে ধীরে দৌড়ের গতি কমিয়ে থামতে হবে।

১০০ মিটার দৌড় : ছোটো দূরত্বের দৌড় অর্থাৎ ১০০ মিটার দৌড়কে স্প্রিন্ট বলে। দৌড় শুরু করার প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণিত হলো। 'অন ইউর মার্ক' বলার সাথে সাথে খেলোয়াড়রা আরম্ভ রেখার পেছনে দুই হাত রেখে এক হাঁটু দিয়ে ভূমি স্পর্শ করবে এবং অপর হাঁটু ওপরে রাখবে। 'সেট' বলার সাথে সাথে পেছন দিক (হিপ) তুলে দৌড় আরম্ভের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। আওয়াজ শোনার সাথে সাথে দৌড় আরম্ভ করবে।

ফলস্ স্টার্ট হলে শাস্তি পেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়বে। কাজেই অনুশীলনের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হবে যাতে ফলস্ স্টার্ট না হয়। দৌড় আরম্ভের সময় চোখের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে থাকবে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গের স্বাভাবিকতা বজায় রাখবে। দৌড়ের সময় সামনের দিকে তাকিয়ে দৌড়াবে। 'সেট' এর সময় দম নিয়ে ৩০ থেকে ৪০ পদক্ষেপ দৌড়ানোর পর স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী শ্বাস নেবে। সমাপ্তি রেখার কাছে এসে শরীর সামনে ঝুঁকিয়ে ফিতা স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। সমাপ্তি রেখা অতিক্রম করেও কিছুদূর পর্যন্ত পূর্ণ বেগে দৌড়ানোর চেষ্টা করবে।

২০০ মিটার দৌড় : ২০০ মিটার দৌড়কেও স্প্রিন্ট বলা হয়। পায়ের পাতার ওপর দৌড়াতে হবে। এ দৌড়ের সময় ২০০ মিটার অথবা ৪০০ মিটার ট্র্যাক ব্যবহৃত হয়। ট্র্যাকে লেনের সংখ্যা ৮টি থাকে তবে ৬টিও হতে পারে। প্রতিটি লেনের নম্বর থাকবে এবং বাম পাশ থেকে ১ নং লেন শুরু হবে। দৌড়ের সময় শরীরের বাম পাশকে মাঠের দিকে রেখে দৌড়াতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করতে হবে। দৌড়ের দূরত্বে সমতা আনার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে স্ট্যাগার্ড বলে। ২০০ মিটার দৌড়ের আরম্ভ ও সমাপ্ত করার পদ্ধতি ১০০ মিটার দৌড়ের অনুরূপ হবে।

কাজ-১ : শিক্ষক ১০০ মিটার দৌড় আরম্ভ ও সমাপ্ত করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

পাঠ-১০ : ৫০×৪ মিটার রিলে দৌড়-

রিলে : যে দৌড়ে ৪জন খেলোয়াড় নির্দিষ্ট দূরত্বে দৌড়াবার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতর একে অন্যকে এক টুকরা কাঠি (ব্যাটন) বদলি দিয়ে দৌড়ায় তাকে রিলে দৌড় বলে। কাঠি বা ব্যাটনের ওপরের অংশটি মসৃণ হতে হবে। এটি কাঠ অথবা স্টিলের তৈরি গোলাকার হয়ে থাকে। সহজে চোখে পড়ে সেরকম রং ব্যবহার করতে হবে। ব্যাটনের দৈর্ঘ্য ৩০ সেন্টিমিটার (প্রায় ১ ফুট) হয়ে থাকে এবং ওজন ৫০ গ্রামের কম হবে না। এই দৌড়ের কাঠি বদল দুই রকমের হতে পারে: দেখে এবং না দেখে। এই দুই রকমের মধ্যে 'দেখে বদলি' প্রথাই নিরাপদ।

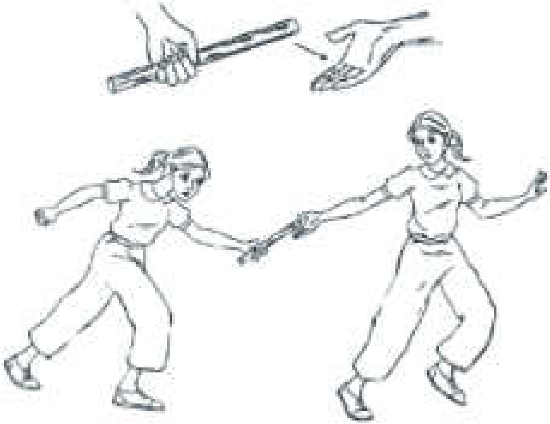

দেখে কাঠি বদল

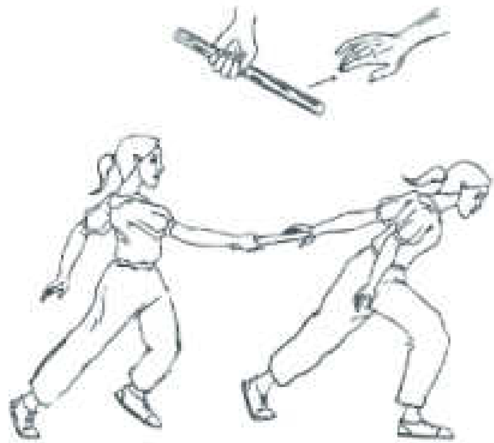

না দেখে কাঠি বদল

কাজ-১ : ৫০×৪ মিটার রিলে দৌড়ের প্রক্রিয়া লিখে দেখাও।

পাঠ–১১ : দীর্ঘ লাফ–

দীর্ঘ লাফের কলাকৌশলগুলোর চারটি প্রধান ভাগ আছে–

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)

২. মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা (টেক অফ)

৩. মাটির ওপর শূন্যে ভাসা (ফ্লাইট)

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান) : দৌড়ে টেক অফ বোর্ডে আসাটা দীর্ঘ লাফের একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ মিটার দৌড়ে এসে টেক অফ বোর্ডে/মাটিতে ধাক্কা দিয়ে লাফ দিতে হবে। টেক অফ বোর্ডে বা ঠিক জায়গায় পা পড়ছে কিনা তা আগেই মিলিয়ে নিতে হবে। একজন সাথী বেছে নিয়ে যে পায়ে লাফ দেওয়া হবে সে পায়ে একটি রঙিন ফিতা বা রুমাল বেঁধে ৩০ মিটার দূর থেকে জোরে দৌড়াতে হবে। সঙ্গী রুমালবাঁধা পা কোথায় পড়ছে তা লক্ষ রাখবে। যে জায়গায় রুমালবাঁধা পা বারবার পড়ছে সে স্পট থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের দূরত্ব মেপে তারপর টেক অফ বোর্ড বা লাফানোর রেখা থেকে ওই দূরত্ব মেপে একটি চিহ্ন দেবে। এটাকে চেক মার্ক ঠিক করা বলে। চেক মার্ক থেকে কয়েকবার দৌড়ে দেখে নিতে হবে যে ঠিক জায়গায় পা পড়ছে কি না। যদি দেখা যায় যে শেষ পদক্ষেপটা টেক অফ বোর্ড থেকে কিছুটা এগিয়ে বা পেছনে যাচ্ছে তাহলে চেক মার্কটা ঠিক ততটা পেছনে বা সামনে আনতে হবে। এভাবে কয়েক দিন অনুশীলন করলে টেক অফ ঠিক হয়ে যাবে।

২. মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা (টেক অফ) : দীর্ঘ লাফে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার সাহায্যের জন্য 'টেক অফ বোর্ড' অর্থাৎ কাঠের শক্ত পাটাতন থাকে। মাটি ছেড়ে উপরে উঠার সময় মনে রাখতে হবে যে–

(ক) মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার জন্য টেক অফ বোর্ডকে পায়ের পাতার সাহায্যে (যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে) সজোরে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠতে হবে।

(খ) টেক অফ বোর্ডে পায়ের গোড়ালি প্রথমে স্পর্শ করিয়ে সাথে সাথে দেহকে দ্রুতগতিতে গড়িয়ে দিয়ে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতার ওপর দেহের ওজন নিয়ে ওপর দিকে ধাক্কা দিতে হবে।

(গ) টেক অফ বোর্ডে ধাক্কা দেওয়ার সময় হাঁটুর সন্ধি কিছুটা ভাঙা থাকবে।

(ঘ) ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে পা সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে। একই সাথে বিপরীত হাঁটু ভেঙে দুলিয়ে সামনে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

৩. মাটির উপর শূন্যে ভাসা (ফ্লাইট) : টেক অফের পর শরীর উপরে তুলে হাতে টান দিয়ে পা পুরোপুরি সামনে নিয়ে হিচ কিকের মাধ্যমে জাম্পিং পিটে অবতরণ করতে হবে।

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং) : মাটিতে নামার সময় পা মাটিকে স্পর্শ করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে পা দুটোকে সামনের দিকে সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে, যাতে যতটা সম্ভব বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। গোড়ালি দুটো প্রথমে বালু স্পর্শ করবে এবং সাথে সাথে হাঁটু দুটোকে ভেঙে নিয়ে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতার ওপর গড়িয়ে সামনে চলে আসতে হবে।

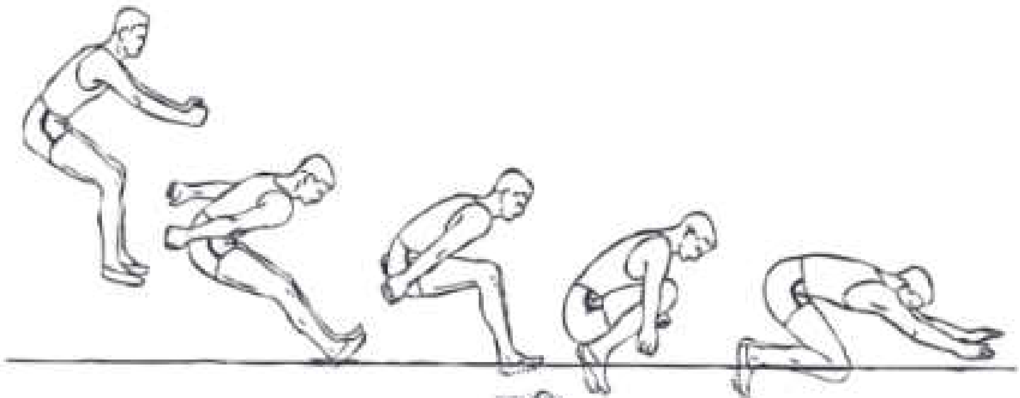

ল্যান্ডিং

কাজ–১ : দীর্ঘ লাফের কলাকৌশলের প্রধান ভাগগুলো লিখে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জিত হয় কিসের মাধ্যমে?

ক. গান-বাজনা খ. খেলাধুলা

গ. বইপড়া ঘ. বিদেশ ভ্রমণ

২. কিক অফের মাধ্যমে কোন খেলা শুরু হয়?

ক. হ্যান্ডবল খ. ফুটবল

গ. বাস্কেটবল ঘ. হকি

৩. ফুটবল খেলার মাধ্যমে অর্জিত গুণ হলো-

i. দলীয় একাত্মবোধ

ii. শারীরিক কর্ম দক্ষতা

iii. আত্মবিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বাটন বদল করতে হয় কোন খেলায়?

ক. ১০০ মিটার দৌড় খ. ২০০ মিটার দৌড়

গ. ৪০০ মিটার দৌড় ঘ. রিলে দৌড়

৫. ক্যাসলিং কোন খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দ?

ক. ক্যারম খ. ব্যাডমিন্টন

গ. দাবা ঘ. ফুটবল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ফারহান খুব ভালো ফুটবল খেলে। তাদের বিদ্যালয় একটি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। খেলার সময় তারা প্রত্যেকে জয়ের ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং বিজয়ী হয়।

৬. ফারহান ও তার দল খেলা শুরু করে কীসের মাধ্যমে?

ক. গোল কিক খ. কিক অফ

গ. কর্নার কিক ঘ. ফ্রি কিক

৭. ফারহানের দলটি বিজয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ-

i. দলীয় একাত্মবোধ

ii. বিপক্ষের খেলোয়াড়কে আটকানো

iii. পরস্পর সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ–শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।